

পৌষ ১৪১৮ : জানুয়ারি ২০১২

বিভাবে, ব্যক্তিগতভাবে
শঙ্খ ঘোষ, মৃদুল দাশগুপ্ত
বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়, গৌতম চৌধুরী
সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভীক মজুমদার
শ্রীজাত, মন্দাক্রান্তা সেন
হিন্দোল ভট্টাচার্য, অর্ণব পণ্ডা

সাক্ষাৎকার
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
উৎপলকুমার বসু

প্রসঙ্গ বিভাব কবিতা
বরুণ চট্টোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য
সোমব্রত সরকার, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

কয়েকটি বিভাব কবিতা

সামনের পাতা
অতীন ভট্টাচার্য

শূন্যস্থান পূরণ

নিজের বলতে এইটুকুই তো

চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিমার যা সম্পর্ক, শূন্যতার সঙ্গে সেই সম্পর্ক বিভাব কবিতার। গোটা একটা পাতায় একটিমাত্র লেখা — হয়তো, দৃশ্যত, স্বল্পায়তন — ছোটো পয়েন্টে। ভেসে থাকা শূন্যতায়। চোখ-সওয়া সেই ফ্রেম কি আয়তক্ষেত্র মাত্র, নাকি কবির গড়ে তোলা? শেষমেশ সেই নীরবতাটুকুই কবির একমাত্র সম্বল নয় কি? বিভাব কবিতায় কিছু বলা মানে, অনেক-অনেক কিছু না বলার ইশারা রাখা। হয়তো যা বলা হবে বাকি বই-এ। হয়তো যা বলা হয়ে উঠবে না বাকি বই-এ।

বিভাব। প্রবেশক। মুখপাত। 'বিভাব কবিতা' নামটাই নিলাম। 'ভূমিকা' বা 'উৎসর্গ'-র সঙ্গে অনেকটাই পার্থক্য বিভাবের। তবু, তাদের মধ্যে এক অকৃত্রিম চলাচলও কি নেই? সে কারণেই বারেবারে উঠে এসেছে 'ভূমিকা' ও 'উৎসর্গ'-র প্রসঙ্গ।

আর, 'মলাটের লেখা'। চতুর্থ প্রচ্ছদ থেকে উঠে আসা কবিতার লাইন। প্রচ্ছদের সম্পূরক। ব্লার্বের সমান্তরাল। সে-ও তো বিভাব কবিতাই।

বিভাবে এই সামান্যই বলার। বাকি বানান ভুল, ছাপার ভূত রইল ভেতরে। অজুহাত নয়, বহু লেখাই এসেছে শেষ মুহূর্তে। কম্পোজিটার আর কত ওভার-টাইম করবেন?

সম্পাদক ও প্রকাশক : সুস্নাত চৌধুরী

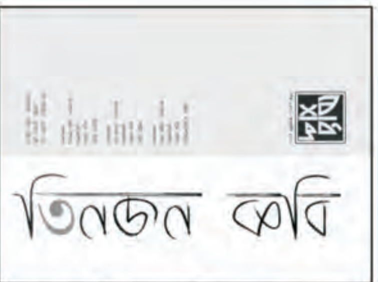
সহ-সম্পাদকমণ্ডলী : সন্বিত পাল ও জয়িতা দাশগুপ্ত
যোগাযোগ : ৪৭/১ ষষ্ঠীতলা লেন, ভদ্রকালী, হুগলি
পশ্চিমবঙ্গ, সূচক : ৭১২২৩২ □ চলভাষ : ৯৩৩০৯ ৪৪৪৪২
বৈদ্যুতিন বার্তা : bodhshabdo@gmail.com
অক্ষরবিন্যাস : শৈবাল ঘোষ, উত্তরপাড়া
মুদ্রণ : ডায়মন্ড আর্ট প্রেস, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট
ম্যাকাও, উত্তরপাড়া

বন্ধুত্বে : অতীন ভট্টাচার্য, শৈবাল মুখোপাধ্যায়, বরুণ চট্টোপাধ্যায়
দেবক বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক মুখোপাধ্যায়, ঋত্বিক মল্লিক
বিশ্বজিৎ পাল, প্রসূন মজুমদার, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য
সিদ্ধার্থ দে ও উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব




কবির প্রথম বই, জানুয়ারি ২০১১


পাঁচজন কবি, জানুয়ারি ২০১৪


তিনজন কবি, জানুয়ারি ২০১৭


এবার গল্প, জানুয়ারি ২০১৯


সৌজন্য সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১০


মৃদুল দাশগুপ্ত সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৩


কবিতা যেমন দেখায়, জানুয়ারি ২০১৬


কবিতার বিপণন, জানুয়ারি ২০১৮


বিপ্লব মুখোপাধ্যায়, জানুয়ারি ২০০৯


বিভাব কবিতা, জানুয়ারি ২০১২


ভেটকি, জানুয়ারি ২০১৫

দ্বিমুখী

শঙ্খ ঘোষ

কথাটা তাহলে পাকাপাকি চলে এল বাংলা কবিতার আলোচনায়। এ কিন্তু একেবারেই অলোকরঞ্জনের একেবারে নিজস্ব এক উদ্ভাবন, নিজস্ব শৈলী, যার শুরু হয়েছিল ওর প্রথম বই *যৌবনবাউল* থেকেই। মনে আছে,

মরণমদমাতাল ডোম সবি করুক উপশম
শ্মশানে, আমি জীবন ছাড়বো না

— লৌকিক ত্রিপদীতে এই ঘোষণা নিয়ে শুরু হয়েছিল অলোকের *যৌবনবাউল*, কবিতাগুলির একটা পটভূমিকা হিসেবে। 'বিভাব কবিতা' এই শব্দবন্ধ অবশ্য অলোক ব্যবহার করেনি তখন, কিন্তু পরে অনেক বইতে স্পষ্টত সেই নামেই চিহ্নিত হয়েছে সূচক লেখাগুলি, যেমন আছে *তুষার জুড়ে ত্রিশূল চিহ্ন* বইতে, যেমন আছে *অস্ত সূর্য এঁকে দিল টেম্পেরা*-তে। হয়তো এসব সূত্র ধরে অনেকেই এখন বিভাব কবিতা হিসেবে কোনও-একটা লেখার জায়গা রাখেন তাঁদের বইতে।

বই-এর মূল কবিতাগুলির আগে ভিন্ন কোনও কবিতার ব্যবহার অবশ্য — ওই নাম ছাড়াই — আরও কোথাও-কোথাও আছে। রবীন্দ্রনাথেই যেমন অনেক। কিন্তু সেসব ছিল প্রধানত উৎসর্গ-কবিতা। সেসবের সঙ্গে যোগ — ভিতরকার কবিতার ততটা নয় — যতটা সেইসব মানুষজনের, যাঁদের দেওয়া হচ্ছে বইগুলি। কখনও সে-উৎসর্গ প্রত্যক্ষ, কখনও-বা পরোক্ষ।

আমার বইতে সচরাচর তেমন কোনও অতিরিক্ত কবিতা থাকে না। 'সচরাচর' বলতে হল কেননা দু-একবার এর ব্যতিক্রম ঘটেছে, যদিও 'বিভাব কবিতা'-ধরনের কোনও নাম দিয়ে ভাবতে চাইনি তাকে। *নিহিত পাতালছায়া*-র যে তিনটি অংশ, তার প্রত্যেকটিরই সূচনায় একটি করে ভিন্ন ধরনের টানা-গদ্যে লেখা কবিতা আছে। কেবল যে রূপগত কারণেই তাকে একটা আলাদা জায়গা দিতে হয়েছে, তা নয়। নিজস্ব নামে কবিতাগুলি অনেক আগেই লেখা, ছাপাও। বইতে বিন্যস্ত করবার সময়ে মনে হল প্রতিটি পর্বের সূচক হিসেবেও লেখাগুলির একটা ভূমিকা থাকতে পারে। বইতে এ-লেখাগুলির স্বতন্ত্র কোনও নাম ছিল না, যদিও নামগুলি ফিরে এসেছে *কবিতাসংগ্রহ*-তে নেবার সময়ে।

অন্য দুটো বই *পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ* আর *গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ*-র সূচনায় যে-কবিতাগুলি, বস্তুত তা উৎসর্গ-কবিতা। দুটো বই-এর মধ্যে এই একটা মিল আছে যে এরা সংখ্যাচিহ্নিত এক-একটা গুচ্ছ, বলাও চলে সবটা মিলিয়ে একটা কবিতা। ওই নামহীনতাকে এক গুচ্ছে ধরে রাখবার কাজ হয়তো খানিকটা করতে পারে সূচনার ওই উৎসর্গ-কবিতাগুলি, এই ভাবনার সঙ্গে জড়ানো ছিল উৎসর্গের ভাবনা। *পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ* বইতে উৎসর্গ-কবিতা নামেই চিহ্নিত আছে লেখাটা। সে-উৎসর্গ প্রয়াত স্বজনবন্ধুদের স্মৃতিতে, আর গোটা বইটাতেও ছড়িয়ে আছে একটা মৃত্যুছায়া। দ্বিমুখী তার টান।

নিজেকে বলা, আয়নায়

মৃদুল দাশগুপ্ত

১৯৮০ সালে প্রকাশিত আমার প্রথম কবিতার বই *জলপাই কাঠের এসরাজ* থেকে শুরু করে ২০১০-এ প্রকাশিত *সোনার বুদ্বুদ* নামের কবিতার বইটিতে, মোট পাঁচটি কাব্যগ্রন্থেই বিভাব কবিতা রয়েছে। নেই *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ* কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের (১৯৯৮) আগে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ১৯৯১-এর *এখন ঘটনাচক্রে*-এ। *এখন ঘটনাচক্রে* পুস্তিকাটির কবিতাগুলি তৎকালে *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*-এর পাণ্ডুলিপিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। *ধানখেত থেকে* বইটি পুস্তিকাকারে ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছিল, সিঙ্গুরে কৃষিজমি বাহুবলে সরকারি অধিগ্রহণের ক্ষোভে, পরে নন্দীগ্রাম পর্বের ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ কিছু লেখা সংযুক্ত করে ২০১১-র বইমেলাতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটিতেও কোনও বিভাব কবিতা নেই।

এই পর্যন্ত লিখে, আর কী লিখব, আমি চিন্তায় পড়েছি। অসুবিধা মূলত দু-টি।

বেশ কয়েকবছর আগে বহরমপুরে একটি ঘরোয়া কবিতাপাঠের আসরে *জলপাই কাঠের এসরাজ* বইটির দু-একটি কবিতা পড়েছিলাম। একটি কবিতায় কৌতূহল প্রকাশ করে, বোধ করি জীবনকাহিনি আন্দাজ করে সদ্যতরুণী একটি মেয়ে কবিতাটির পিছনে ঘটনা কী জানতে চান। বৈধভাবেই সংযত প্রশ্ন সাজিয়ে। ওই কবিতাটিও আমার সদ্য তরুণ বয়সে রচিত, ওই বয়সের ব্যথাবিধুর লেখা। আমি খুলে, বিস্তারিতভাবে সব বলে দিই, সেই কাহিনি।

পাশে ছিলেন উৎপলকুমার গুপ্ত, ওই যে *সময়* পত্রিকা বের করেন। খুবই স্নেহ তাঁর আমার প্রতি। পরে খুব বকাবকি করেন। 'তুমি বলে দিলে! একেবারে গল্প করে বলে দিলে! তাহলে কবিতা লিখেছ কেন? কবিতায় কি এভাবে সব বলে দাও তুমি?'

আমি বুঝেছিলাম, অন্যায় করেছি।

এখন মনে করছি, 'বিভাব কবিতা' নিয়ে লিখতে বলা হয়েছে, বিভাব কবিতাগুলি সম্পর্কে খুলে বলতে পারব না।

দ্বিতীয় অসুবিধা হল, আমার ভারী সঙ্কোচ রয়েছে নিজের কবিতা নিয়ে কিছু বলার। বরং আমি বলি, প্রথম বই *জলপাই কাঠের এসরাজ*-এ কেন আমি বিভাব কবিতা রাখলাম। *জলপাই কাঠের এসরাজ* বইটিতে যেসব কবিতা আছে, তার কোনও পাণ্ডুলিপি ঠিকঠাক সাজানো ছিল না। অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকে লেখা কবিতাগুলি কিছুদিন আমার পকেটে থাকত, তারপর নতুন লেখা লিখলে, আগের কবিতাগুলি পিচবোর্ডের একটি বাক্সের ভেতর রাখতাম। মনে পড়ে, জুতোর বাক্স। এইভাবে একটি বাক্স ভরে যাওয়ায় দ্বিতীয় একটি বাক্সও। ১৯৭৮ সালে বই বের করার ভাবনা শুরুর পর-পর কয়েকটি সপ্তাহে রানাঘাট থেকে জয় (গোস্বামী) শিবপুর থেকে গৌতম (চৌধুরী) এসে সেই দুই বাক্স কবিতা বেছে দিল। বেশ কিছু কবিতা হারিয়েও গিয়েছিল। বাছবার সময় জয় ধরন অনুযায়ী কবিতাগুলি সাজাল, প্রেমের কবিতা, রাজনীতির কবিতা — এইসব। একটি কবিতা 'অতিরিক্ত' মতো হয়ে গেল। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের *যৌবনবাউল* বই-এ সেই যে '...সঙ্গোপনে অলোকরঞ্জনা' — আমি সেই বিভাব কবিতায় বুঁদ হয়েছিলাম সেই সময়। জয় বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বিভাব কবিতা হিসেবে এটা দিয়ে দাও'।

জলপাই কাঠের এসরাজ-এর সেই বিভাব কবিতা :

কুসুম, কবে যে তুমি ব্রত
ভেঙে চলে গেছো, আর হাওয়া
আমাকে টুকরো করে, ভাঙে
বলে, কে গো, তুমি কার মতো?
জানি আমি আলো আঁধারের
ভিতরে প্রস্তুত নই আজো —
পুড়ি, ক্ষই, হাওয়ায় হাওয়ায়
যতোখানি, তুমিও কি ততো?

কী বলব, এ লেখা সম্পর্কে। *জলপাই কাঠের এসরাজ* বের হওয়ার সময়, সেই ১৯৭৮-৮০-তে, আমার, ছিল সে হাহাকার। তা কত বছর আগের কথা!

জলপাই কাঠের এসরাজ বই-এ বিভাব কবিতা দেওয়ার পর ঠিকই করে ফেললাম এরপর যদি আরও বই বের হয়, দেব বিভাব কবিতা।

এভাবে কাঁদে না বই-এর বিভাব কবিতা :

> তস্কর? গৃহস্থের আঙিনায় চাঁদ দেখে ঘুমিয়ে পড়েছো?
> দলে এসো।

এ একেবারে বিপ্লব বাসনায় লেখা। *এভাবে কাঁদে না* বের হয়েছিল ১৯৮৬-তে। ১৯৮৮-তে প্রকাশিত *গোপনে হিংসার কথা বলি* বইটির দেড় পঙ্‌ক্তির বিভাব কবিতাটি বের হয়েছিল *শতভিষা* পত্রিকায় :

> ছুটছে শিকারি আজও শিকারের পিছনে পিছনে
> পিঠের তূণীর গেছে খসে...

নকশালপন্থীদের নিয়ে লেখা।

সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৮-এ। এই বই-এর বিভাব কবিতা :

> চলো চলো পিঁপড়ের ভাষা
> কথা বলা নদীর ওপারে
>
> টুপটাপ ছত্রী সেনার
> ছায়া সামরিক লাফ মারো
> হাঁটো হাঁটো দেশলাই কাঠি
> মহিষের পিঠে চড়ে বসো
> চারানা আটানা ফুটো করে
> ওড়ো ওড়ো কুয়াশার শ্বাস
> বেঁকে যাও পাঁচিলের পাশে
> নাপিতের ক্ষুর টেনে হাসো

এ আমার মনোবাসনা। আমার ভঙ্গি, অবস্থান।

আর, *সোনার বুদ্বুদ*-এর বিভাব কবিতা :

> মৃত যে, নিঃশ্বাস ফেলবে, লেখো বাক্য অরূপ শাসনে
> লেখো তো তেমন দেখি, যেন ঝর্না নিজে স্নানরতা
> আঁকো তো দর্পণ, চিত্রী, অশ্রুধারা চরাচর... মুহূর্ত আসনে
> তাহলে মস্তকে তুলবে উন্মাদেও জনস্রোত
> কালক্রমে হবে রূপকথা

তা, নিজেকে বলা, আয়নায়।

প্রসঙ্গ বিভাব কবিতা

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

সরকারি কাজে সে-সময় আমাকে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে হত। হয়তো সকালবেলায় গাড়িতে উঠলাম, দেড়শো, দু-শো কিলোমিটার দূরের কোনও প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলা, আলোচনা করা, তারপর কোনও ডাকবাংলোয় বা কাছাকাছি সার্কিট হাউসে রাত কাটিয়ে পরের দিন ফিরে আসা — এই ছিল প্রায় রোজনামচা। কত জায়গা, কত গ্রাম যে ঘুরেছি! একবার, তখন ফাল্গুন মাস। মেখলিগঞ্জে ফুলের আগুন লেগেছে। দুপুরবেলা বেহুলা বর্মনের ভাওয়াইয়ার সুরে লেলিহান শিখার মতো সে আগুন ছড়িয়ে গেল দিগ্বিদিকে। ...আরেকবার শিলিগুড়ি থেকে চলেছি কোচবিহার। সময় — শ্রাবণ-শেষ। দার্জিলিং জেলা ছাড়িয়ে একটু পরেই জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি ছাড়িয়ে কোচবিহার... কালো সাপের মতো পিচের রাস্তা পেরিয়ে গাড়ি চলেছে তো চলেছেই! যতদূরেই যাই শুধু এক মেঘলা আকাশ আর আদিগন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে শুধু পাট পচানোর গন্ধ! দেখতে আমার চেতনা আচ্ছন্ন করে উঠে এল একটি পঙ্‌ক্তি —

> পাটের পচন-গন্ধে মোহিত সংসার...

ঠিক কোথায় গিয়েছিলাম আজ আর মনে নেই; কিন্তু সমস্ত ভ্রমণের পথে, সমস্ত কাজের মধ্যে, কথার মধ্যে, তারপর শুধু ওই একটি পঙ্‌ক্তিই আমার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে... শুধুমাত্র ওই একটি পঙ্‌ক্তিই, আর কিছু নয়। সন্ধ্যায় যখন ফিরছি তখনও সেই গুমোট মেঘ, কখনও টিপটিপে বৃষ্টি... কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি আর খুঁজে পেলাম না। তবু ওই পঙ্‌ক্তিটি মাঝে-মাঝেই ফিরে আসত, বিষণ্ণ করে দিত আমাকে।...

> গোরক্ষগাথা
>
> পাটের পচনগন্ধে মোহিত সংসার।
> ভরন্ত কাঞ্চন ক্ষেত, সন্ধ্যা আসে নাবি।
> দাঁড়ায়ে গোরক্ষনাথ আগুলি দুয়ার।
> গোয়াল করিছে আলো জ্যোতির্ময়ী গাভী।
>
> নাবাল গবাক্ষে ঘোরে শ্রাবণের দিন —
> শব্দের ওঙ্কারে হয় তাহার স্বরূপ।
> বাহিরে গোরক্ষ একা ভিতরে প্রহরা
> সুরভিতময় রাগে ভিতরে বিদ্রূপ।
>
> প্রহরে প্রহরে মেঘ মেঘের বরন
> ভরন করিল যবে স্বপ্নরূপী কায়
> কুঙ্কুমের আভিজাত্যে ওষ্ঠে গড়ন
> মরণে গাভী হয় গোরক্ষের দায়।
>
> গোরক্ষ বরেতে গাভী হইল গাভিনী
> পাটের পচনকালে উঠোনের দিকে
> মাঝরাতে শুনিলে খেলে শিশু সে ঠাকুর।
> গোষ্ঠে করেন খেলেন গোরক্ষ ঠাকুর।

কবির হস্তাক্ষরে গোরক্ষগাথা

গোরক্ষ নাথের পাঁচালি বড়ো অদ্ভুত রহস্যময় সুরে গাওয়া হয়। উত্তর দিনাজপুরের দলুয়ার মেলায় গিয়ে এই গান প্রথম শুনি। একটানা টিপটিপে বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যার মতোই এ গানের সুর কিছুটা একঘেঁয়ে, ঝিম ধরা, দীর্ঘ এই সমবেত গান নাথ সম্প্রদায়ের আরাধ্য গোরক্ষনাথের বন্দনা। নাথ গুরুদের মধ্যে প্রসিদ্ধতম গুরু মীননাথের শিষ্য গোরখনাথ বা গোরক্ষনাথ। কিন্তু এত সব ইতিহাস তখন অর্থহীন, ঝাপসা হয়ে আমার চেতনায় তখন রূপ নিচ্ছে কবিতার পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলি...

> ভরন্ত কাঞ্চন ক্ষেত, সন্ধ্যা আসে নাবি।
> দাঁড়ায়ে গোরক্ষনাথ আগুলি দুয়ার।
> গোয়াল করিছে আলো জ্যোতির্ময়ী গাভী।

আর থামতে হয়নি। বাকি পঙ্‌ক্তিগুলি এসেছিল অনায়াসে।

কবিতাটি আমার কাছে, শুধু তার রহস্যময়তার জন্য নয়, আরও বিশেষ প্রিয় তার ভাষার জন্য। কারণ, আমি তো ঠিক আধুনিক কবি নই, বরং সেকেলেই বলা যায়, আর সেই কারণেই আমি যেন এইরকম একটা ভাষাই খুঁজছিলাম, যা সমসাময়িক নয়, অনন্তকালের।

কবিতাটি পাঠককে বিভাবিত করেছে কিনা, ঠিক জানা নেই; কিন্তু আমার পরবর্তীকালের সমস্ত কাব্য চেতনার মূল বিভাব কবিতা হিসাবে একে চিহ্নিত করতে পারি নিঃসন্দেহে। এ অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল অবশ্য আরও অনেক আগেই; যে কবিতায়, তার নাম *হারানো পদ্মিনীর জন্য* (কাব্যগ্রন্থ : *হলুদ বনে কলুদ ফুল*)। কবিতাটির রচনাকাল সত্তরের দশকের শেষের দিকে এবং প্রকাশিত হয়েছিল *লা পয়েজি* পত্রিকায়। কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল এর অনেক পরে, ১৯৯১ সালে। এই কবিতাটি যেন হঠাৎই ঝিলিক দিয়ে আবার হঠাৎই মিলিয়ে গিয়েছিল আমার অস্তিত্ব থেকে। আজ ভাবলে এসব মনে হয়!

নিজের কবিতা সম্পর্কে হয়তো শ্রদ্ধাশীল সবাই! আমিও। কিন্তু সে শ্রদ্ধা প্রকাশ করলে মনে হয় শ্রদ্ধা নয়, বরং অহঙ্কারই প্রকাশিত হল। তাই হল কিনা জানি না, তবু সম্পাদকের দাবি, না লিখেও তো উপায় নেই!

কিন্তু প্রশ্ন হল, এসব কথা শুনতে কি কারো আগ্রহ হবে? কেনই বা হবে?

আর, হ্যাঁ। আরও একটা কথা বলা হয়নি, *গোরক্ষগাথা* অর্থাৎ এই বিভাব কবিতাটি *পা রেখেছেন পরম* কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয় ১৯৯৮-এর মাঝামাঝি।

একটি না-লেখা কাব্যের নান্দীমুখ

গৌতম চৌধুরী

বিভাব কবিতা কি কবিতাবই-এর ভূমিকা? দু-একটি রবীন্দ্রবইতে দেখেছি, গোড়ায় একটি ছোটোকবিতা, পরে আবার ভূমিকা-শিরোনামে আরও একটি কবিতা। তাহলে, বইশুরুর ওই ছোটোকবিতাটিকে তো আর ভূমিকা বলা যায় না। ভূমিকা নামের কবিতার আড়ালে অনেক প্রচ্ছন্ন বক্তৃতাও রয়ে যেতে পারে, থাকতে পারে অনেক অজুহাত, টীকাটিপ্পনি, সাফাই। আর শুরুর সেই কবিতাটি, সে যেন একটা হাতছানি। কাব্যতত্ত্বের হিসাব অনুযায়ী, দুনিয়াদারির যেসব কার্যকারণ মানুষের মনে নানান কিসিমের ভাব জাগিয়ে তোলে, কবিতায় যখন তা পুনর্সৃজিত হয়ে পাঠকের মনে রসাস্বাদনের সূচনা করে, তাই হল গিয়ে বিভাব। অবশ্য এতকিছু জেনেমেনে কি কবি তাঁর বই সাজান? তিনি হয়তো ভাবেন, যদি একটি কবিতার চোখের তারায় চোখ ফেলে পাঠক পেয়ে যান পুরো কবিতাবই-এর একটা মৃদুতম আভাস, তবে তেমন একটা লেখা দিয়ে শুরু করলে মন্দ হয় না। যেন কচুপাতার ওপর টলটলে বৃষ্টিজলের ফোঁটা, আর তার ওপর ভেসে উঠেছে মহাগগনের রংধনুকের ছায়া। কবে যেন কোন মহাজন রটিয়ে দিলেন, এই হল বিভাব কবিতা! তারপর বাংলাবাজারে সেটাই হয়ে উঠল একটা রেওয়াজ।

আমার চটি-চটি চিকন-চিকন বইগুলির শুরুতে, কোনওটায় অমন সূচনাকবিতা জুড়েছি, কোনওটায় বা জুড়িনি। যেখানে জুড়েওছি, সবসময় যে তা সংজ্ঞামানা বিভাব কবিতা হয়ে উঠেছে, হলফ করে সেকথা বলতে পারি না। যেমন, ঈশ্বর শব্দটির দ্বারা আমরা সচরাচর যা বুঝি, তেমন কোনও কর্তাপুরুষকে মোকাবেলা করার কোনও লক্ষণ, আমার প্রথম কবিতাবই *কলম্বাসের জাহাজ*-এ (১৯৭৭) হারগিজ নেই। অথচ তার সূচনাকবিতায় রয়েছে এক 'উন্মত্ত ঈশ্বর'-এর কথা, যাকে বলা হয়েছে — 'তোমার পরিত্রাণ নেই'। হয়তো বা নিজেকেই নিজে বলা এসব কথা!

এইসব ভেবেচিন্তে, *নির্বাচিত কবিতা* (২০১০) সাজানোর সময় একটা নতুন শব্দ ইস্তেমাল করলাম — মুখপাত। তথাকথিত ওই বিভাব কবিতাগুলির শীর্ষে এইভাবে লিখলাম — *মুখপাত : কলম্বাসের জাহাজ* বা, *মুখপাত : অমর সার্কাস*, ইত্যাদি। তবে, বিভাব কবিতাই বলি বা মুখপাতই বলি, এরকম একটা কবিতা আমার খুব মনের মতো হয়ে রয়েছে। মজার কথা, লেখাটা কিন্তু কোনও বই-এর শুরুতে নেই, রয়েছে একেবারে শেষে। কারণ আর কিছুই না, প্রায় বছর বিশেকের মতো সেটা বেপাত্তা ছিল। সেই হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের কিচ্ছাটা তাহলে বলা যাক।

একসময় (১৯৭৪-৯২) আমরা *অভিমান* নামের একটা কবিতাকাগজ করতাম। তারই উনত্রিশতম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৯৭) *একটি না-লেখা কাব্যের নান্দীমুখ* শিরোনামে আমার একটা পাঁচালিধরনের লেখা ছাপা হয়েছিল। তার কোনও কপি আমার কাছে ছিল না। সংখ্যাটাও কালক্রমে বিলিবাট্টা হয়ে ফুরিয়ে গেল। ফইলকপিও নেই। তারপর জীবনও গড়িয়ে গেল অন্য খাতে। না-লেখা কাব্য নয়, ঢুকে পড়লাম অন্যসব কবিতায়। এইভাবে সেই লেখাটির পর দেখতে-দেখতে প্রায় দু-দশক কেটে গেল। এইসময় ঢাকার গল্পকার বন্ধু পারভেজ হোসেন যখন বললেন, *নির্বাচিত কবিতা*-র পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে, কবিতাটির কথা খুব মনে পড়তে লাগল। কী করা যায়! তখন আর-এক বন্ধুর কথা মনে এল — সন্দীপ দত্ত। এক সন্ধ্যায় চলে গেলাম টেমার লেনে লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি। পুরোনো সব *অভিমান* বার করে দিলেন সন্দীপ। তার থেকে সহজেই বেপাত্তা কবিতাটি খুঁজে পাওয়া গেল।

অতঃপর এটিই হল আমার *নির্বাচিত কবিতা*-র শেষ এন্ট্রি। শিরোনাম, *একটি না-লেখা কাব্যের নান্দীমুখ*। পরের লাইনে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে, একটু ছোটো হরফে, *যেটি বর্তমান সংকলনের মুখপাত হতে পারে*। এ যেন এমন এক বিভাব কবিতা, যা পুরো কাব্যটিকেই বিনির্মাণ করে নিল। এই *নির্বাচিত কবিতা*-ই এইভাবে যেন হয়ে উঠল সেই না-লেখা কাব্য। সেই গায়েবি পাঁচালির একটি স্তবক তাহলে তুলে দিই প্রিয় পাঠিকাপাঠকের জন্য —

অতঃপর বন্দি সব প্রাণের দোসরে
কে কোথায় ভাই বন্ধু গ্রামে গ্রামান্তরে
শবর পুলিন্দ ব্যাধ নিষাদ চণ্ডাল
কেহ মাঠে ধান বোনে কেহ ফেলে জাল
কেহ বা ফিটার মিস্ত্রি কেহ করণিক
যন্ত্রগণকিনী কেহ রাঙুনী নাবিক
চাটিগাঁ পুরুল্যা হতে ত্রিপুরা কাছাড়
কাকদ্বীপ সন্দীপ হতে কোথা কোচবিহার
মুখচ্ছিরি নাই তবু জ্বলন্ত নয়ান
তোষ্মাদের কৃপা ভিন্ন কীটদষ্ট গান

আমার বিভাব

সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা কি নিজের কথা নিজেই বলে দিতে পারে না? কোথায় একরকমের কবিতার শুরু, আর কোথায় তা শেষ হয়ে অন্য কোনও প্রান্তে যাত্রা করে, তা কি স্বতঃপ্রমাণ নয়? তবে কেন তাকে অন্য একটি মিতাক্ষরী চার-ছ-লাইনের বিভাব কবিতা দিয়ে ভাগ করার চেষ্টা?

আমার নিজের প্রায় সব কবিতার বই-ই স্বল্পায়তন — একটিই থিমনির্ভর। সেগুলোতে কখনও-কখনও শুরুতে অন্য কারো পঙক্তি-সমূহ ব্যবহৃত, বইটির সার্বিক পরিচয়ের সঙ্গে যা খাপ খেয়ে গেছে। কিন্তু সচেতনভাবে বিভাবকবিতা আমি ব্যবহার করেছি মাত্র দু-টি বইতে — যা তত ছোটোমাপের নয়, শক্তবাঁধাই।

প্রথমেই ধরা যাক *ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা*-কে। বইটি লেখার পূর্ণসময়টাতে নয়, কিন্তু বেশকিছুটা কাল ধরে ঘনিয়ে ছিল এক তীব্র ব্যক্তিগত বিপর্যয় —

সন্তানের মৃত্যুআশঙ্কা। সেই ভয় বইটির অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আবার আছে নিজস্ব প্রেম, বিষাদ, আত্মহননেচ্ছা, ক্রোধ। এই বিচিত্র অনুভূতিমালা শেষপর্যন্ত দেখা দিল পর্যায়ক্রমে। ক্রোধ, নেশা, অসুস্থতা এবং সেসব থেকে উপশম — একধরনের ম্যাজিকের মতো ছুঁয়ে ফেলল কবিতাকে।

বইটির প্রথমাংশ ছিল *কথা*। মানবীকথা, রূপকথাকে এক মানবীর চোখ দিয়ে দেখে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সেই প্রতিষ্ঠার প্রতি ক্রোধ, উদাসীনতা, আবার তাকে জাগিয়ে তোলার প্রতিকোণ ব্যাকুলতা। সেই পর্যায় শুরু করেছিলাম রূপকথার পৃথিবীতে টোকা দেওয়ার চেষ্টা করে :

তাহলে কীভাবে আর তোদের শোনাব রূপকথা,
যদি না বোঝাতে পারি পরে আমরা কোনদিকে যাব —
পায়ের পাতায়, বুকে, বিঁধে নেব কাঁটা ও পুরুষ
আমরাই রাক্ষুসি হব, সৎমা হব, গড়ে তুলব ডাইনি-গোপনতা।

এই কাঁটা, পুরুষের কাঁটাকে বুকে গেঁথে নেওয়ার বাসনা আর কষ্ট, নিজের দুই পুরুষ, প্রেমিক ও পুত্রকে গিলে খাওয়ার প্রবণতা, অপবাদ — এইসব মিলিয়েই তৈরি হয়ে উঠেছিল এক কালো হিংস্রতার কবিতাগুচ্ছ, যা নেশা ও চাপা বিষাদের ছায়াপাড়া। সেখানে যে নারী বাস করে, তার অর্ধ-অঙ্গ নারীর হলেও বাকি আধখানা ঈশ্বরীর। অর্ধেকটা নিজেই সুরা, অর্ধেক নেশাধীনা। সে পুরুষের গড়া রূপকথাকে জাগিয়ে তুলতে চায় নারীর কথা দিয়ে, লিখতে চায় নতুন *ঠাকুরমার ঝুলি*। তার চয়িত লোককথায় মিশে যায় তারই নিজস্ব পরিধি, রান্নাঘরের মশলাগন্ধ। আর সেই নারী যখন গান গাইতে চায়, লেখে কবিতা, পুরুষ তাকে ট্রামলাইনে *ঠেলে* দিয়ে নিজে অমর হয়ে ওঠে। পুত্রের প্রাণ যখন ক্ষীণ সুতোয় ঝুলছে, তার মনে হয়, 'এত খিদে, তাই রাক্ষুসিরা / দিয়েছিলি বীজে গর্ভতাপ'। কিন্তু সেই হিংস্রতা থেকে সে আস্তে-আস্তে উঠে আসে এক অন্য জগতে যা মাদকে মেদুর, কবিতাক্ষরে অস্পষ্ট, ডানা পুড়ে যাওয়ার পরেও সে টের পায় এক বিপুল উড়াল, 'দহন-স্ফোটক যেন / দুটি পোড়া ডানাময় অক্ষর ফুটেছে।'

সেই *নেশা* পর্বকে আলাদা করার চেষ্টা রয়েছে বিভাব কবিতায় —

আকাশ, সে নেশাতুর টানে
মদখোর রাত্রির নীচে
এত দ্রুত দু'হাতে *টেনেছে* —
তারপর উড়ে গেছে দূরে
রেখে কিছু অলীক পালক
আকাশ আমায় দিল আলো
আমি তাকে ভরে দেব গানে।

কিন্তু এসব তো আলোর কবিতা নয়, এখানে ছড়িয়ে আছে বাসনা, ঘোর, বিষণ্ণ সন্ধের নেশা।

এই নেশার কথা ফিরে-ফিরে আসে লেখায়, পুরুষ যেখানে ধর্ষবাসনার মুঠি ঈষৎ আলগা দিয়ে বুঝিয়েছে, 'যোদ্ধা ও ঘোটকীর মতো / এই আমাদের অন্ধত্রাণ, আর সেই মুঠি থেকে লাফ দেওয়ার একটু আগে দেখা যায়, 'নীচে জলছে / মাতৃতন্ত্রের মৃত টিলা'। সেখানে নেশাপ্রবণ মেয়ে কালো চাঁদকে খুঁজে পথবিকেলে ঘুরে বেড়ায় আর চাঁদ তাকে দেয় শুধু খরতাপ, 'সে মেয়ে আর ফেরে না ঘরে, পথকেও সে জানেনি / স্মরচাঁদের গরল খেয়ে ঘোরে যে মরবিকেলে'।

এই নেশা ক্রমে বিষ হয়ে ওঠে। নিজের বিষে নিজেই সাপিনী জ্বলেপুড়ে যায় —

আকাশকে উড়ে যেতে বলে
পাতালকে বলে উড়ে যেতে
পাতালের নীচে ডানাহারা
সাপিনী রেখেছে ফণা পেতে
সাপিনী, সামান্য তুই মেয়ে
আর তোর যৎসামান্য বিষ
ছুঁলেই তক্ষুনি কেঁপে উঠে
যা নিজস্ব সব ঢেলে দিস
বিষ লিপ্ত করলি ত্রিজগৎ
বিষে দুই ডানা গেল পুড়ে
ও গরলখাকি, সে ডাকলেও
পৌঁছতে পারবি না তত দূরে...

সেই বিষ, বিষাদবড়ি খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে বিষণ্ণতা পায়ে-পায়ে কুকুরের মতো বাড়ি ফেরে। নিদ্রার বড়ি খেয়ে অনিদ্রাকে কুকুরের মতো *চেনে বেঁধে* সকালে ফিরিয়ে আনতে হয়।

আমার একটি এক ফর্মার বই *কুট্টিনীবিলাস*-কে এই পর্বের অন্তর্গত করতে হয়েছিল প্রকাশকপক্ষের কথায়। সেখানে সাধারণ মেয়ের জীবন মিশে যায় বেশ্যার জীবনে। নারী বলে, 'উষা উত্থানের আগে আজ আমি কুলত্যাগ করে / অধঃপতনের দিকে চলে যাব'। কিন্তু শেষে থাকে এক প্রার্থনা, সুস্থ হওয়ার, জুড়িয়ে যাওয়ার, 'হে শাস্তা, আমার রাত্রি পুনর্বসু হোক। তুমি কলঙ্কভূষণ'।

উপশম পর্বে স্বর কিছুটা শান্ত হয়ে আসে :

প্রভাতে জেগেছ আজ শীতশেষে
জেগে, তাকে দেখেছ রক্তিম আরো
জ্বরপরবশ
তপ্ত গা'খানি থেকে
পাতাপোড়া গন্ধে বোঝো জ্বরের তাড়স
প্রভাত জেনেছে আজ তোমার রক্তিমে

এই জ্বরমোচনের শ্রান্তি আর টাটকা গন্ধময় হাওয়ার ভেতর মেয়েটির প্রাণ চোখে-চোখে অতর্কিত বিভাবার রাত্রিকে জেনে নেয়।

দ্বিতীয় আলোচ্য বই *নীলবেগুনি শরীরের দেবী*-তে ছিল তিনটি পর্ব — *মালিনীসুন্দর*, *গীতবিতান*, *জামের দেহের মতো*।

এই বইতে যৌবনশেষের রক্তাভ প্রেম এসেছে, এসেছে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষঙ্গকে, আর শেষে আবার বিষাদরোগ, তার হ্যালুসিনেশন, তার ঘুমবড়ি, তার শকথেরাপি।

মালিনীসুন্দর পর্বের বিভাবকবিতা —

রঙের নীচে রঙ, আড়ালে জ্বলে যায়
বর্ণরহিতার ফাগুনস্তব
আরক্তিম সেই মুকুর ছায়াহীন
দেখায় রক্তের ধাতবতা
ধাতুর সুন্দর ধমনী খুলে দিলে
জাগে যে-বিদ্যার লজ্জাত্রাস
বাগান জেগে ওঠে রতিআতুর আর
আমিই সে মালিনী বীতপলাশ

শেষ বসন্তের রক্তিমতায় এই পর্বের কবিতাগুলি আচ্ছন্ন। সেখান থেকেই আসে গান, *গীতবিতান* পর্বে, বুঝি সেখানে সান্ত্বনা মিলবে —

ব্রহ্মাণ্ড ছিলেন একা। দৃষ্টিবিরহিত ও বধির
তাঁরে দিলে চক্ষুধন, কানে দীর্ঘ আবহসংগীত
'বেলা বাড়ে, ঘরে চলো, পাতে অন্ন জুড়াইয়া যায়'
এইরূপ বার্তা দিলে — ভববন্ধ হল সুগ্রন্থিত
এবার এ পুস্তক দাও জন্মান্ধকে, সুর দাও কানে
জাগো জাগো রে সংগীত, বাঁকা হয়ে পড়ো রৌদ্র গানে

কিন্তু সেই গানের শরণ নেওয়ার মুহূর্তেও বারবার দেখা দেয় বিবমিষা — 'গীতবিতানের গায়ে সেই রক্ত লাগাল চকিতে / আমার চিবিয়ে-খাওয়া, বমিতে আবার যাকে তুলি'। এক উন্মাদ অর্ধনর দেখা দিয়ে যায় গানের পঙ্ক্তিতে-পঙ্ক্তিতে। বোঝা যায় এরপর কী পরিণতি আসবে, কোন অসুখ। *জামের দেহের মতো*-তে কষা, তীব্র, গাঢ় নীল-বেগুনি রঙের এক পৃথিবীতে ফিরে যেতে হয়। কিন্তু সেখানে তখন আর মাদকের উল্লাস-ত্রাণ নেই, আছে মৃত্যুর রাত্রি।

চকচকে নীলবেগুনির ফলা হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে দিল
কচুবনে ঘোর বিকেলের আলো, ভ্রম হয় ঘর
এবার পুকুরে জাল ফেলতেই উঠে আসবে
বউ-ঝিদের চুল আর সোনারুপো মেশানো রাংতায়
মূর্ছা ও খিঁচুনি
আজও আমি আশা করি
এখানেই একদিন দেখা হবে
হাঁটুভাঙা রূপদেবতার সঙ্গে —
হাতে মধুপর্কভরা বাটি

নেশার পর যে হ্যালুসিনেশন হয়, তাতে দেখা দেয় যুগের রূপান্তর, ঝমঝমে পিয়ানোয় ব্যালাড, চারপাশ থেকে চেপে-বসা এক পরাবাস্তব জগৎ। আশা হয় না, এ থেকে কোনওদিন বেরোনো যাবে।

এই যে কয়েকটি পর্বকে, থিমকে দুই মলাটে ধরে রাখার চেষ্টা, নিজের জীবনকেও, আমার কাছে তারই নাম বিভাব কবিতা।

আয়না আর আকাশ

অভীক মজুমদার

ল্যান্ডস্কেপ বিষয়ে তিক্ত একটা বিতর্ক হয়েছিল বতিচেল্লি আর লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মধ্যে। ল্যান্ডস্কেপ আঁকা একদম পছন্দ করতেন না বতিচেল্লি, মনে করতেন, ওসব হল, 'সীমিত আর মামুলি ধরনের তদন্ত'। উত্তরে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বলেন যে, 'এই চিন্তার যুক্তি নেই'। বতিচেল্লি জানিয়েছিলেন, 'কোনও স্পঞ্জে রং মাখিয়ে যদি দেয়ালে ছুঁড়ে মারা হয়, সেই ধ্যাবড়া দাগেও ল্যান্ডস্কেপের দেখা মিলতে পারে'। উত্তরে দা ভিঞ্চির সাফ জবাব ছিল, 'যে কেউ দাগটার দিকে একদৃষ্টে তাকালে নানারকম জীবজন্তু, যুদ্ধ, পাথরকুচি, সমুদ্দুর, মেঘ, ঝোপঝাড় কিংবা আরও অনেককিছুই দেখতে পেতে পারে, ...তবে তাতে শিল্পকর্মের ব্যাখ্যা হয় না। আসলে, বতিচেল্লি খুব নিকৃষ্ট ল্যান্ডস্কেপ আঁকতেন।'

নিজের কাব্যগন্থে 'বিভাব কবিতা' প্রসঙ্গে কথা বলার আগে পুরোনো গল্পটা বলে নিলাম। 'বিভাব কবিতা'-র দিকে তাকিয়ে নানা ব্যাখ্যা দিতে পারি, তবে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন হল, কবিতার মান বা ম্যাজিক অভিপ্রেত উত্তরণে পৌঁছতে পেরেছে কিনা। স্পঞ্জের ধ্যাবড়া দাগ থেকে ল্যান্ডস্কেপ — সবই মঞ্জরিত হয় দ্রষ্টার নৈপুণ্যে। এখনও সবসময় মনে হয়, এই উত্তর-চল্লিশেও, আমার লেখালেখিতে ধরা দেয়নি, যে-ইশারা বিদ্যুতে কাঁপায়।

টুক করে ঢুকে পড়লাম বিভাব কবিতার কাছে পৌঁছনোর রাস্তায়। ওই একটি শব্দে। ইশারা। আমার কাছে বিভাব কবিতা একটা ইশারা। সব ইশারা সবাইকে সবসময় দেখতেই হবে এমন কোনও মাথার দিব্যি নেই। তবু রেখে দেওয়া। বারে-বারে সংকেত পাঠানো। ছেলেবেলায় শোনা একটি গান খুব মনে পড়ে, 'দেখা হবে ছাঁদনাতলায় / বলে গেল ইশারায়...।'

২

বিভাব কবিতার ক্ষেত্রে আমি শুধু মনে রাখি, গ্রন্থভুক্ত বা পর্বভুক্ত কবিতার চারিত্র্য আর পশ্চাৎভূমি যেন লুকোনো থাকে ইশারায়। গানের ভিতর দিয়ে ভুবন দেখার মতো। কিংবা, আয়না দিয়ে আকাশ।

চেতনে-অবচেতনে বিভাব কবিতার বিষয়ে একটা আগ্রহ অবশ্য অল্পবয়স থেকেই ছিল। আমার প্রথম আদ্যোপান্ত পড়া কবিতার বই *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা* (*নিউ এজ*, ১৯৫৭)। অধুনালুপ্ত সেই বই-এর উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল — 'যাও পাখি, বলো তারে'। ওইসব কড়া-কড়া ধার-ঝকঝক কবিতার শুরুতে এমন একটা পেলব পঙ্‌ক্তি? ভেবে তখন কূলকিনারা পাইনি। এ-ও কি একরকমের বিভাব কবিতা নয়? কিন্তু, এর অস্যার্থ অনুধাবন করতে সময় লেগেছিল। অল্পবয়সে ভেবেছিলাম, থিসিস-অ্যান্টিথিসিস থেকে সিনথেসিস। মন খুব সায় দেয়নি। অনেক পরে পড়তে-পড়তে বুঝেছি এসব পঙ্‌ক্তির মানে —

হে জননী
আমরা ভয় পাইনি।
যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেছে ব'লে
আমরা বিরক্ত।
মুখ বন্ধ করে
অক্লান্ত হাতে —
হে জননী,
আমরা ভালোবাসার কথা ব'লে যাব।

নিজের বই যখন হল, অবচেতন থেকে বোধহয় হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল এসব ভাবনা। প্রথম বই *লিরিকবাহিনী* বেরিয়েছিল আমার 'ছাত্রবন্ধু' কালিকাপ্রসাদের একক উদ্‌যোগে আর উৎসাহে। *অনুষ্টুপ* থেকে। তারপর আরও যে কয়েকটি বই বেরিয়েছে সবেতেই আজ দেখি একটা নকশা রয়েছে বিন্যাসে। গোড়ার উৎসর্গ আর তার বিপরীত পৃষ্ঠায় ঢুকে আছেন সর্বদা রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর সঙ্গে কখনও হাছন রাজা, কখনও গুরুদাস পাল, কখনও লালন ফকির। আমার 'রাজনৈতিক' কবিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী, এরকম প্রশ্ন ছাপার হরফে দেখেছি। বুঝতে পারি, মাঠে মারা গেছে ইশারা।

৩

শেষ দু-দুটো কাব্যগ্রন্থে অবশ্য আরও স্পষ্ট অবয়বে আছে বিভাব কবিতা। সেক্ষেত্রে, বিশেষত এখনও পর্যন্ত শেষ কাব্যগ্রন্থ *বারুদ সংকেত*-এ আমাকে সম্ভবত প্রভাবিত করেছে, শঙ্খ ঘোষের *পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ* কাব্যগ্রন্থের সেই অমোঘ প্রারম্ভিক প্রবেশিকা — 'ভোর এল ভয় নিয়ে, সেই স্বপ্ন ভুলিনি এখনও'। তারও ওপরে অবশ্য লেখা আছে 'উৎসর্গ'। একে কি বিভাব কবিতা হিসেবে পড়লে ভুল হবে?

যাঁর কাব্যগ্রন্থের সূচিপত্রে 'বিভাব কবিতা' সরাসরি উল্লিখিত থাকে সেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও শিখিয়েছেন ইঙ্গিতের টানটোন। 'মারাঠি প্রজাপতি আমার, ঘুরে-ঘুরে ঈশ্বরের কাছে / অভঙ্গ শোনাও, / বাঙালি ভালোবাসা আমার, কবিওয়ালার ধরনে তুমি কিছু হাফ-আখড়াই গাও —' (*রক্তাক্ত ঝরোখা*) আর জয় গোস্বামী — 'শায়িত সিন্ধুকে দেখো পাশ থেকে / সে দণ্ডায়মান'। (*এক* / উৎসর্গপত্রের অন্যদিকে উদ্ধৃত)

৪

ইদানীং অবশ্য মাঝেমাঝে মনে হয়, বিভাব কবিতা না রাখলেই বা কী! বিভাব কবিতা কি এক অর্থে পাঠকের ওপর একটু চাপ সৃষ্টি করে না? শুধুই কি তা ফটকের পাল্লা? সেটুকুরও আদৌ দরকার আছে কি কোনও? হাত দিয়ে বা গান দিয়ে খোলার প্রশ্নই ওঠে না, যদি মুক্ত প্রাঙ্গণ হয়। ধুলোয় বসেও তো কেউ খেলতে পারে। পড়ার কি 'ঠিক পথ' হয়? বাতলে দেওয়া সমুচিত?

সুইডেনবোর্গ অনুভব করেছিলেন, দৃশ্যমান প্রকৃতির পেছনে রয়েছে আরেক রহস্য-ঋদ্ধ জগৎ। তাঁরই সম্প্রসারণে বোদলেয়র ভেবেছিলেন, প্রাকৃতিক বস্তুরাজি সেই গুপ্ত-সুপ্ত জগতের প্রতীকসমূহ। প্রকৃতি নয়, যা দেখি, বা যা চারপাশে ছড়িয়ে

আছে, তা আসলে প্রতীকের গুদামঘর; এ ভাবনা কি আজকের পাঠককে খুব স্বস্তিকর অনুভবে নিয়ে যাবে? শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতায় মাছ থাকলেই তাকে প্রতীক-সংকেত হিসেবে সর্বদা না দেখাই ভালো। কিছু মাছ তো স্রেফ ভেজে খাওয়ার!

বিভাব কবিতা নিয়ে সেজন্য ভয় করে। বিশেষ এক প্রকোষ্ঠ দিয়ে পাঠককে দেখাতে চাইছি নাকি কবিতার শরীর?

পাঠকের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে চাইছি হয়তো ভেতরে-ভেতরে। সে তো সাংঘাতিক কথা! পরবর্তীকালে যদি কোনও বই বেরোয়, তাহলে নতুন করে ব্যাপারটা ভেবে দেখব। কোনও কথা অবশ্য দিচ্ছি না। অলমিতি।

দরজা সেজে দাঁড়িয়ে

শ্রীজাত

বিভাব কবিতা রাখা হয় কেন? বই-এর মূল অংশ শুরু হওয়ার আগেই এই কবিতার উপস্থিতি কি বিশেষ অর্থবহ? তার প্রয়োজন কি অস্বীকার করা যায় না? এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে দেখি আমার কবিতার বইতেও বিভাব কবিতা এসে যাচ্ছে। কী ব্যাপার? এবার উত্তরটা খুব সোজা, বড়োরা দিয়েছেন, তাই আমিও দিয়েছি। চিরকাল দেখে এসেছি শঙ্খবাবু, উৎপলদা, ভাস্করদা — এঁরা সব বই শুরুর আগে একটা করে কবিতা রেখেছেন, অনেক পাঠক 'বিভাব কবিতা!' বলে একেবারে তোলপাড় করে দিচ্ছেন, তাই আমিও দিলাম। আমারও বিভাব কবিতা হল। অত ভালো হল না, কিন্তু রইল তো? ব্যাস!

এ তো গেল নিজের সঙ্গে খানিক ঠাট্টার অজুহাত। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে সত্যিই জানি না বিভাব কবিতার অতশত যৌক্তিকতা। অনেকে 'প্রবেশক কবিতা' বলে থাকেন, কিন্তু নাম পালটালে তো আর প্রসঙ্গ পালটায় না। স্কুল-কলেজের ছুটির দুপুরগুলোয় বাড়ির ছোট্ট বইতাক থেকে কবিতার পুরোনো বইগুলো নামিয়ে যখন দেখতাম, নিজের অজান্তেই প্রবেশক কবিতার প্রতি একটা আকর্ষণ তৈরি হত। ভাবতাম, কেন এই একটা কবিতাকে বাকি লেখাগুলোর দরজা করে রাখা হয়েছে বইতে? কেন একে পেরিয়ে তবে পৌঁছতে হবে ভেতরের পাতাগুলোয়? এই যে বই-এর গোড়াতেই একটা প্রবেশক, মানে, এন্ট্রান্স পরীক্ষা, এ কি শেষমেশ পাঠকের যোগ্যতা বিচারের কারণে? হবেও বা। ইদানীং বই-এর পেছনদিকের মলাটেও আবার কবিতা দেখতে পাই। সে-কবিতা কি তাহলে কোথাও বই-এর মলাটবদ্ধ ঘোষণা করে? তাহলে কি কবিতাতেও শেষমেশ জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে ঢুকতে হবে? অথবা কবিকে অতটা নিষ্ঠুর না মনে করে এ-ও ভাবা যেতে পারে যে, গোড়ার এই একটি কবিতা আসলে বই-এর বাদবাকি কবিতার সম্মিলিত চেহারার প্রতিনিধিস্থানীয় কেউ। এ যেন পাঠ শুরু করার আগেভাগেই তৈরি করে দিতে চাইছে বই-এর আবছা একটা মেজাজ, আলগা একটা সুর। 'ভোর এল ভয় নিয়ে / সেই স্বপ্ন ভুলিনি এখনও' বা 'আর কী চাইতে পারো কলকাতায় তাঁতকল ছাড়া তুমি চেয়েছ কবিতা' — এ তো গোটা একটা সময়ের কথাই বলে দিতে চাইছে, যে-সময়ের মধ্যে ঢুকে রয়েছে খোদ বইটিও। তবে কি আক্ষরিক অর্থেই প্রবেশক হতে হবে এইসব কবিতাকে? খেয়ালখুশি মতো, ভালোলাগার নিরিখে যে-কোনও কবিতাকে বসানো যাবে না এই আসনে? এসব দ্বিধা আমার কাটেনি, কাটবে যে, এমন আশাও রাখি না আর। তবু যখন একটু ছড়িয়ে, বেশ কিছু লেখা নিয়ে পাণ্ডুলিপি করার সুযোগ পেলাম, তখন আমারও ইচ্ছে হল বই-এর একটা দরজা তৈরি করতে। তেমন পোক্ত দরজা নয় অবশ্য, কড়া নাড়তে গেলে ভেঙে পড়তে পারে, তবু, দরজা তো!

সেই লোভেই প্রবেশক কবিতার আমদানি, হ্যাঁ, আমারই ব্যর্থ বইগুলোতে। আমার লেখাপত্তরের একটা বড়ো অসুবিধা হল এই যে, কবিতার ক্ষেত্রে হয়তো অনেকদিন কিছু না লিখেই কাটিয়ে দিই। আবার লেখা এলে একসঙ্গে লিখেও ফেলি বেশ কিছু। যখন যেমন জোটে আর কী। বছরখানেকের মধ্যে নানা পত্রপত্রিকায় লেখা কবিতা কোনওরকমে জড়ো করে পাণ্ডুলিপি করেছি, এরকম বইও আমার আছে দু-একখানা। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এক ধারাবাহিক সময়স্রোতে একযোগে লিখে ফেলা কিছু কবিতা নিয়ে হয়েছে বই, যে বই-এ হয়তো কোথাও একটা আপাতকেন্দ্রীয় সুর থাকলেও থাকতে পারে। নানা ছবি, ভাবনা, বক্তব্যের সমাহারের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে একটাই সুতো, যা এদের এক বই-এ পাশাপাশি থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। এইরকম বই যখন করা যায়, তখন প্রবেশক কবিতার একটা তাগিদ ভেতর থেকেই আসে, এসে যেতে চায়। মনে হয় একটাই তো সুর, একটাই তো স্রোত — তার একটা ধরতাই, একটা ঘাট দিয়ে দিলে কি মন্দ হবে খুব? মনে হয় যদি শব্দ দিয়ে সব ক-টা লেখার একটা মলাট আঁকারই চেষ্টা করি, তবে কি বেজায় ভুল করে ফেলা হবে সেটা? তারপর ভাবি, তা হোক গে ভুল, রাখি একটা লেখা। থাকল, থাকুক না। তাই বলে যে রাখার জন্যেই লিখে ফেলি একটা লেখা, তা নয়। পাণ্ডুলিপি তৈরি করে তোলার সময়েই কোনও না কোনও লেখা 'প্রবেশক'-এর বোর্ড গলায় ঝুলিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। কেন কে জানে, দেখেই মনে হয়, হ্যাঁ, এই তো সে। একেই দরজা বানিয়ে সেঁটে দেওয়া যেতে পারে বই-এর গোড়ায়। আমি তো অন্তত তা-ই করি। অত মর্মার্থ-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-সম্প্রসারণ-সংকোচন-সতেরো-তিরানব্বই-ক্ষেন্তিপিসি বুঝিনে বাপু, এই রইল তোর বিভাব কবিতা।

তারপর সব বই-এর ভেতরেই সন্ধে নামে একদিন, বয়েস বাড়ে, আলো কম হয়ে আসে। বইগুলো তখন অন্যভাবে পড়তে হয়। সেই সন্ধের নেভা-আলোয় এককে সময়ে প্রবেশককে অচেনা লাগে, খানিকটা শহুরে মরীচিকার মতো। কোন পথে যে নিয়ে যেতে চায় সে, কোন গলির মোড়ে একলা দাঁড় করিয়ে রেখে চলে যেতে চায়, বুঝতে পারি না। আমার লেখাপত্তর অত সাহসী নয়, বোকাসোকা মতো। প্রবেশককে কে পথ দেখায় তার ঠিক নেই। সন্ধের লোডশেডিং পাড়ায় চশমা-টশমা হারিয়ে তার যা-তা কাণ্ড। তবু তো আমারই লেখা, থাক আগেভাগে দরজা সেজে দাঁড়িয়ে। ওকেও তো করতে হবে কিছু।



বিভাব-ভাবনা

মন্দাক্রান্তা সেন

ছোটোবেলা কেটেছে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত-এ, যেমন সাধারণ বাঙালির কাটে। খুব ভালো লাগত *কিশলয়*-এর কবিতাগুলি। আর *শিশু*, আর *চিত্রবিচিত্র*। আরেকটু বড়ো হলে নজরুল-সুকান্তর কবিতায় গা গরম হত। জীবনানন্দ এসেছেন অনেক-অনেক পরে। এঁদের কবিতায় কোনও বিভাব কবিতার ব্যাপার আমার নজরে আসেনি।

১৯৮৯ সালে দাদা আমাকে বইমেলায় একটা বই উপহার দিল। বইটা সে বছর আনন্দ পুরস্কার পেয়েছিল। আনন্দ পুরস্কার খায় না মাথায় মাখে সে বিষয়ে, সত্যি কথা বলতে কী, আমার কোনও সম্যক ধারণা ছিল না। বইটার নাম *ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?* বইটা খুলে অপেক্ষাকৃত ছোটো হরফে প্রথম নামহীন কবিতাটিই আমার পায়ের তলা থেকে জমি সরিয়ে নিল। সমকালিক কবিতার সঙ্গে সেই আমার প্রথম সংযোগ।

বিভাব কবিতা কাকে বলে আমি তখন জানতামই না। অথচ আধুনিক যুগের কবিতার সঙ্গে আমার বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ঘটিয়েছিল একটি বিভাব কবিতা। হৃদি ভেসে গেছিল, ডুবে গেছিল অলকানন্দা জলে...

আমার প্রথম বই যখন হয়, তখন জয় গোস্বামী চেয়েছিলেন বইটায় একটা বিভাব কবিতা যাক। আমার পাণ্ডুলিপি উনি করে দিয়েছিলেন। আমি একটা কবিতা লিখে ওঁকে দেখাই। উনি সেটাকে কাট-ছাঁট করে ছোটো করে আনতে বলেন। তারপর সেটাই বিভাব কবিতা হয়ে দাঁড়ায়। মনে আছে, একটা পঙ্‌ক্তিতে উনি সামান্য একটু সংশোধন করে লিখে দিয়েছিলেন, 'নীল ব্যাকরণের খাতায়'... এই 'নীল' কথাটা ওঁর দেওয়া। আমার মনে হয়, এর জন্যই কবিতাটা অনেক বেশি লক্ষ্যবেধী হয়ে উঠতে পেরেছিল। এর জন্য আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। বিভাব কবিতা ব্যাপারটা আমার মাথায়ও ঢোকে তখনই।

এরপর থেকে আমার প্রায় সব কবিতাবইতেই আমি বিভাব কবিতা রেখেছি। বিভাব কবিতা বলতে কী বোঝায়, সেটা জানার পর থেকেই আমার কাছে সেটা কবিতাবই-এর প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আমি তাদের আর 'বিভাব কবিতা' বলি না। বলি 'সংকেত কবিতা'। তারা আমার পরবর্তী কবিতাগুলির একটি ইঙ্গিত। আবার একটি বই-এ *বিভাব কবিতা* নামে একটি লেখা আমি বই-এর শেষে রেখেছি। সে বেশ একটা মজা হয়েছিল।

আমাকে অনেকে বলেছেন আমার প্রথম বই-এর বিভাব কবিতার কথা। ওটা নাকি খুবই ভালো হয়েছিল। তাঁদের কথা আমি অবিশ্বাস করিনি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার কবিতাবই-এর শ্রেষ্ঠ সংকেত কবিতা বলে মনে হয় কাব্য সংগ্রহের বিভাব কবিতাটি। লজ্জার মাথা খেয়ে নিজের কবিতা নিজেই উদ্ধৃত করছি —

শব্দ।
শব্দের পর শব্দ।
শব্দের পর শব্দের পর শব্দ।
থামো।
ফের গোড়া থেকে শুরু করো।
শব্দ।
না।
আরও গোড়া থেকে।
ধ্বনি।
ধ্বনির ভেতরে ধ্বনি
ধ্বনির ভেতরে ধ্বনির ভেতরে ধ্বনি
কী পেলে?

কী পেয়েছি জানি না সত্যি। আমার মনে হয়, আজীবন বিভাব কবিতাই লিখে চলেছি শুধু, শুধুমাত্র সংকেতটুকু। আসল কবিতার দেহ আজও গড়তে পারিনি আমি, ছুঁতে পারিনি তার আত্মা। সে শুধু ইশারাটুকু দিয়েই লুকোচুরি খেলছে আমার সঙ্গে।

যেদিন তাকে ছুঁতে পারব, হয়তো সেদিন আর বিভাব কবিতা লিখব না আমি, আসল কবিতাই লিখব। কী জানি!

তুমি, অরক্ষিত কাব্যগ্রন্থের বিভাব কবিতা : কীই বা লিখি?

হিন্দোল ভট্টাচার্য

আমার *তুমি, অরক্ষিত* কাব্যগ্রন্থের চারটি পর্যায়ের চারটি বিভাব কবিতা। কিন্তু আমি এখানে প্রথম বিভাব কবিতাটির কথা বলেই ক্ষান্ত থাকব। কেননা পাঠককে এবং অন্যান্য লেখকদের অযথা বিব্রত করে লাভ নেই। এতে সম্পাদকেরও ক্ষতি এবং আমারও শব্দের অপচয়। *তুমি, অরক্ষিত* কাব্যগ্রন্থের বিভাব কবিতাটি যে বিভাব কবিতা হিসেবেই লেখা, এমন নয়। কবিতাটি আগে অবশ্য দিয়ে দেওয়া দরকার।

আলেখ্য

তোমার সহজ মুখ বৃষ্টিপতনের শব্দে ভেজা
বহুযুগ ধরে যেন তাকিয়ে রয়েছে
ফুলের নিদ্রিত স্বপ্ন যেমন ফুলের থেকে দূরে মিশে যায়
পরাগরেণুর মর্মে; আমি তার বেদনায় বিঁধে
তোমার চোখের মতো
আমারই মূর্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

বোঝাই যাচ্ছে, বিভাব কবিতা সত্ত্বেও কবিতাটির একটি নাম ছিল। কারণ নাম ছাড়া এই কবিতাটি ফুল ছাড়া ফুলগাছের মতো। আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি এই কবিতাটিই বা কেন আমি বিভাব কবিতা হিসেবে বেছে নিলাম! কারণ আমার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেটি হয়, তা এককথায় অবাস্তব একটি ব্যাপার। অবশ্য বাস্তব-অবাস্তবের মধ্যে ফারাকটি অনেক আগেই মুছে গেছে। তো, কবিতাটি লেখা এক যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তে। আমার প্রথম প্রেমিকা আমার সামনেই দুর্ঘটনায় মারা যান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোলো। না, শাড়ি পরে নয়, রীতিমতো স্কার্ট পরে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় একটা গাড়ি ওভারটেক করতে গিয়ে ধাক্কা মারে। মাথা রেলিঙে এবং... আর মনে করতে চাই না। এরপর তো কেটে গেছে বেশ কয়েকটা বছর। কিন্তু বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় তাঁর মৃত মুখের কথা আমি কোনওদিনই ভুলতে পারিনি। *তুমি, অরক্ষিত* কাব্যগ্রন্থে তাঁর মৃত্যুর পর আমার একাকী হেঁটে বেড়ানোর একটি পর্যায় আছে। সেই পর্যায় বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিনয় মজুমদারের ভাষায় 'নিষ্পেষণে ক্রমে ক্রমে অঙ্গারের মতন সংযমে... হীরকের জন্ম হয়, দ্যুতিময়, আত্মসমাহিত'। আমি জানি না, কতটা হীরকের মতো আত্মসমাহিত হয়েছে শোক। কিন্তু তার থেকে অনেকদিন আলাদা থাকার পর আমি অনুভব করতে পারলাম, সে আছে। অর্থাৎ যাওয়াটাই সব যাওয়া নয়।

বলা বাহুল্য, এখন যখন আমার নিজেরও মধ্যে ভীষণরকম মৃত্যুচিন্তা আসে (অচ্যুৎদা, তাপসদার আত্মহত্যার পর এবং আমার নিজের জীবনের নানা বিপর্যয়ের পর) তখন আমার নিজেরও মনে হয়, মৃত্যু তো শেষ কথা নয়। আর বেঁচে থাকাটাও কি তেমন বেঁচে থাকা? তেমন বেঁচে থাকা যদি না হয় তো এই বেঁচে থাকার অর্থটা কী? যাক, এখনকার সময় নিয়ে এরকম দশ বছর পর হয়তো লেখা যাবে, যদি বেঁচে থাকি। অতীতে ফিরে যাওয়া যাক। আমার *তুমি, অরক্ষিত* কাব্যগ্রন্থে প্রেম, মৃত্যু এবং যৌনতার সঙ্গে ঘর করেছি প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে। আর তার বেশির ভাগ জুড়েই রয়েছে মৃত্যুর সঙ্গে কথোপকথন। বিচ্ছেদের

মধ্যে মিলনের এক শাশ্বত রূপ খুঁজে চলার চেষ্টা। (এসব লিখতে আমার নিজের লজ্জা লাগছে। কারণ নিজেরই কবিতার বই তো! কিন্তু সুস্নাত নাছোড়বান্দা।) তাই এক আলেখ্য নিজের রচনার মধ্যে, নিজের ভাবনার মধ্যে, নিজের আত্মার চেতনার মধ্যে ঘোরে-ফেরে। সে কখনও প্রেমিকার মধ্যে কখনও স্ত্রীর মধ্যে কখনও অন্যের স্ত্রীর মধ্যে কখনও বা পথচলতি অনেকের মধ্যে দেখতে পাই। আবার কখনও-কখনও বা এক দিবাস্বপ্নের মতো অবস্থায় সেই রূপ আমার সঙ্গে কথা বলে। স্কিৎজোফ্রেনিক হলে যা হয় আর কী!

তাই এই *আলেখ্য* কবিতাটি আমার মনের মধ্যে কথা বলে উঠল, আর তারই সূত্রে টানা দু-বছর ধরে বাকি কবিতাগুলি লেখা হয়ে গেল। বলা যেতে পারে, *তুমি, অরক্ষিত* কাব্যগ্রন্থের প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলির শিরা-উপশিরা ধরে টান দিয়েছিল এই *আলেখ্য* কবিতাটিই। পাঠক এবং লেখকদের মধ্যে যাঁদের *তুমি, অরক্ষিত* কাব্যগ্রন্থটি পড়বার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে (বেশি লোকের হয়নি অবশ্যই, কেননা বেশি সংখ্যক বই-ই *অফবিট প্রকাশনা* তাদের গোপন কুঠুরিতে বন্দি করে রেখেছে। আমার কাছেও বইটি নেই। তাই বেশ শান্তিতে আছি।) তাঁরা নিশ্চয়ই ধরতে পারছেন বা আমি বলার আগেই পেরেছেন। শুধু একটু ব্যাখ্যাসুলভ আকর্ষণ এড়াতে না পেরে বলতে চাই, 'তোমার চোখের মতো আমারই মূর্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছি' বোধহয় সব লেখকের সব পাঠকের কাছে বলার কথা। কারণ লেখা শেষ হয়ে গেলে তো লেখক মৃত। তখন পাঠকের চোখে লেখক নিজেকেই দেখেন। আরও অবশ্য মানে আছে। কিন্তু থাক! নিজের কবিতা নিয়ে না-হয় নিজে নাই বা বললাম!

আমার বিভাব আমার কবিতা

অর্ণব পণ্ডা

প্রথম কবিতার বই বেরোনোর আট বছর পরে বেরোয় আমার দ্বিতীয় কবিতার বই *বিভাবকবিতা*। মাঝখানে এত বছরের রোদ, জল, মেঘ, বৃষ্টি আর কবিতা লেখার স্তব্ধ দুপুরগুলি। স্থায়ী কোনও চাকরি নেই। একবেলা, দু-বেলা গৃহশিক্ষকতার মাঝে এই দুপুরগুলিতে আমি কবিতা আর শরীরের তীব্র অথচ গোপন ভাষাগুলি টের পেতাম। ভাড়াবাড়ির আচ্ছাদন গাঢ় হয়ে এসেছিল সেসময়। মা স্কুলে বেরিয়ে যাওয়ার পর স্তব্ধ দুপুর উঠে আসত ঘরে। সিলিং ফ্যানের হাওয়ায় নেশা ধরে যেত। যেন একটানা শব্দে হাইওয়ে ধরে ছুটে চলা তীব্র টায়ার। তার নীচে আমি ঝুঁকে পড়েছি সাদা পাতার সামনে। কবিতার বিজবিজে অক্ষরের মধ্যে আমি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাই, ভেসে উঠি আবার।

কীভাবে গড়ে উঠেছিল *বিভাবকবিতা*-র একটার পর একটা কবিতা ঠিক মনে নেই নির্দিষ্টভাবে। তাছাড়া বই হিসেবে কবিতাগুলিও যখন বাছাই হয়ে উঠল বীতশোকদার হাত ধরে আলাদা-আলাদা কোনও স্মৃতি জেগে উঠল না মাথার ভেতর। বরং কেমন ভয় হতে লাগল, একটা বিষণ্ণ ভয়। কী হবে এগুলো প্রকাশ করে! কে-ই বা পড়বে! এই মফস্সল বাজারের বন্ধুর দোকানে এই যে দিনের পর দিন পেরিয়ে যায় আড্ডায়, সামান্য সখ্যে, এই তো বেশ। আবার কেন?

সবে চাকরি পেয়েছি স্কুলে। মে মাসের এক দুপুরবেলা স্কুলের ছাত্রদের সামনে গিয়ে প্রথম দাঁড়ালাম যখন মনে হল অসংখ্য আয়না আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এতগুলো উজ্জ্বল আয়নার সামনে কোনওদিন কখনও দাঁড়াইনি। আমার নিজস্ব দুপুরগুলোর নীরব মৃত্যু ঘটে যেতে লাগল তারপর। স্কুল ছুটির পর ঝরনার মতো বেরিয়ে আসে ছেলেমেয়েদের দল। কোনও-কোনও দুষ্টু, ডানপিটে ছেলেদের সঙ্গে অদ্ভুত রসায়ন শুরু হয় আমার। আমার চশমা যে অতিরিক্ত সমীহ আদায় করে নেবে এতে আর সন্দেহ কী! কিন্তু কবিতা! সে যেন ঝাপসা হয়ে-হয়ে যেতে চায় ক্রমশ। পুরোনো লেখাগুলো বেরোচ্ছে *দেশ* পত্রিকায়। আর সহকর্মী থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পর্যন্ত হেসে কথা বলতে এগিয়ে আসছে, এ তো কম উপভোগ্য নয়! কিন্তু সবকিছু থিতিয়ে পড়বার পর যখন বাসের ভিড়ের ভেতর ডুবে থাকি বাড়ি ফেরবার সময়, সাইকেলের প্যাডেল ঘুরিয়ে যখন ভেসে যাই, মন বড়ো অস্থির হয়ে ওঠে দুপুরের জন্য। দুপুরের পর দুপুর — তার সমস্ত রৌদ্র আর স্তব্ধতা শুষে নিল হাজার-হাজার আয়না।

বিভাবকবিতা আমার সেই হারিয়ে যাওয়া দুপুরগুলোর নির্জন স্বাক্ষর। কেউ পড়ুক বা না পড়ুক এই কবিতাগুলির একটা নিথর অস্তিত্ব আমার জীবনে রয়ে গেছে। এক-একটা কবিতা বা কাব্যগ্রন্থের মায়া একজন কবির কাছে যেরকম রয়ে যায়। সেই সময়ের এক বন্ধু আমার কবিতা বই ছেপে আনার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। মনে পড়ে, কলকাতা থেকে *বিভাবকবিতা*-র কয়েক কপি হাতে করে নিয়ে এল যেদিন, গ্রামীণ বাজারের আধো-অন্ধকার বাসস্টপে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। হাতে করে কয়েক কপি দিয়ে সে আবার বাসে উঠে চলে গেল, ধোঁয়া ছেড়ে। বলে গেল, ট্রান্সপোর্টে বাকি বইগুলো উঠে পড়েছে। চলে আসবে দু-এক দিনের মধ্যেই। বাড়ি ফিরে বইগুলো হাতে নিয়ে বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। কিছুটা অবসন্ন, কিছুটা আড়ষ্ট। প্রথম বই প্রকাশের উচ্ছ্বাস অবিস্মরণীয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় কবিতার বই প্রকাশের পর কেমন যেন কুণ্ঠা গ্রাস করে নিল আমাকে। সে কি নিজেকে সকলের সামনে তুলে ধরবার কুণ্ঠা? গড়ে তোলা কবি পরিচয়ের কুণ্ঠা? বুঝতে পারি না।



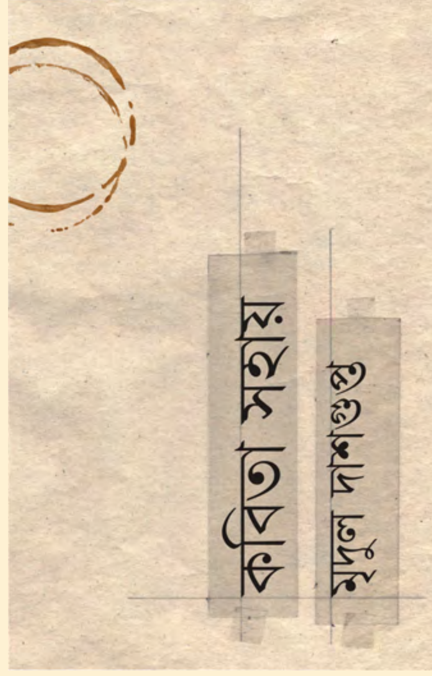
বিভাবকবিতা বেরোয় ২০০৭ সালে। এই ২০০৭ সালে আমার জীবনে পরপর কয়েকটি ঘটনা ঘটে যা চিরস্থায়ী স্মৃতির ভেতর চলে যায়। এ বছর আমরা ভাড়াবাড়ি ছেড়ে নিজেদের তৈরি করা বাড়িতে উঠে আসি। বাংলা ফাল্গুন মাসের কোনও একদিন, নির্জনে প্রকাশিত হল *বিভাবকবিতা*। এ বছরই কলকাতা বইমেলার *দেশ* প্যাভিলিয়নে কবিতাপাঠের আমন্ত্রণ পাই এবং গিয়ে দেখি আমার অন্যতম প্রিয় কবি জয় গোস্বামী সেই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত কবি ও সঞ্চালক। কলকাতা থেকে *বিভাবকবিতা* ছেপে এনে দিয়েছিল যে বন্ধু, ক্রমশ আমার থেকে দূরে সরে গেল, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে। ঘটনাগুলি পরপর ঘটে এবং পরস্পর ঘনসন্নিবিষ্ট। *বিভাবকবিতা* যেন এ সমস্ত কিছুর স্মৃতিফলক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার জীবনে।

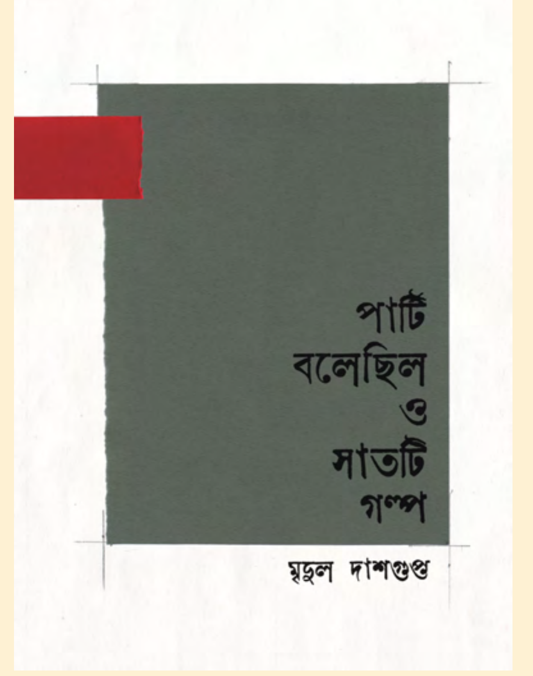
এ মুহূর্তে, স্বাভাবিকভাবেই *বিভাবকবিতা*-র সঙ্গে একটা সময়ের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। কিছুটা দূরে তো সরেই এসেছি। 'বিভাব' অর্থে পরিচয়। কাব্যগ্রন্থে বিভাব কবিতা থাকে মূল সুরটিকে পরিচয় করানোর জন্য। তা যেন দরজা। সেই দরজা খুলে চলে যাওয়া যায় কাব্যগ্রন্থের ভেতর। আমি প্রথমে একটি বিভাব কবিতা রাখার কথা ভাবলেও পরবর্তীকালে তা বদলে নিই। সমস্ত কবিতাই একটি দরজা হয়ে উঠুক অথবা প্রত্যেকটি কবিতাই স্বতন্ত্র দরজা হিসেবে দেখা যাক, এই ভাবনা উজিয়ে আসে। তাছাড়া কবিতা, কাব্যগ্রন্থ, লিখিত শব্দরাশি এটুকুই একজন কবিতা লেখকের একমাত্র পরিচয়। *বিভাবকবিতা* আমারই পরিচয় হয়ে উঠুক, আমার জীবনযাপন, ভাবনার সুর হিসেবে বেজে উঠুক — এই চেয়েছি মনে-মনে।

এখন *বিভাবকবিতা*-র লেখাগুলির দিকে তাকালে সেই সময়ের স্তব্ধ দুপুরগুলি যেন ভেসে ওঠে। দুপুর তার স্তব্ধ ডালপালা বিস্তার শুরু করে। শুকনো পাতা পেরিয়ে যাচ্ছে গিরগিটি, তার শব্দ, পাখি ও কীটপতঙ্গের ডাক, দুরন্ত রৌদ্রের পাশে গাছগাছালির শান্ত ঝোপঝাড়, ছায়াচ্ছন্ন নিঃসাড় বন, আর তার ভেতর দিয়ে দেখতে পাই, একটি শক্তিশালী প্রবীণ গোসাপ ধীরে-ধীরে ভারী বুকে হেঁটে যাচ্ছে।

বোধশব্দ-র নতুন বইপত্র

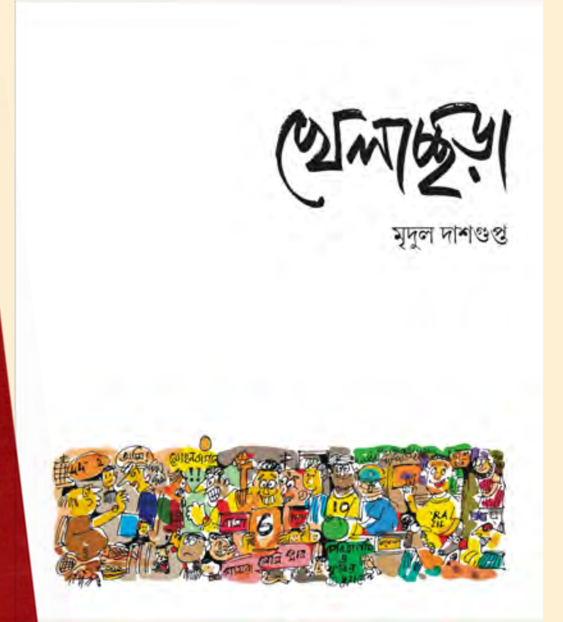












সংগ্রহ করতে নীচের লিংকগুলিতে ক্লিক করুন

https://boighar.in/product-tag/bodhshabdo/

https://www.haritbooks.com/product-brands/bodhshabdo/

ইতিকথা বইঘর • ধ্যানবিন্দু • বাতিঘর (বাংলাদেশ)



পৌষ ১৪২৬ : জানুয়ারি ২০২০

কবিতার কাটাকুটি
কবিতার পরিমার্জন
কবিতার সম্পাদন

প্রবন্ধ

বরুণ চট্টোপাধ্যায়, অভীক মজুমদার
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য
শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবির কথা

শঙ্খ ঘোষ, মৃদুল দাশগুপ্ত
গৌতম চৌধুরী, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়
সুতপা সেনগুপ্ত, রাণা রায়চৌধুরী
অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক বাজারী
রাজদীপ রায়, কৃষ্ণ মণ্ডল

সম্পাদকের কথা

দেবদাস আচার্য, অরণি বসু
কমলকুমার দত্ত, মন্দাক্রান্তা সেন

কথা ও কাহিনি

সংকলন: পৃথ্বী বসু

জসীম উদ্দীন, জীবনময় রায়
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র গুপ্ত
আল মাহমুদ, ভাস্কর চক্রবর্তী, তুষার রায়
পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, নিশীথ ভড়

ক্যালিগ্রাফি: মোস্তাফিজ কারিগর

সংগ্রহ করতে নীচের লিংকগুলিতে ক্লিক করুন

https://boighar.in/product-tag/bodhshabdo/

https://www.haritbooks.com/product-brands/bodhshabdo/

ইতিকথা বইঘর • ধ্যানবিন্দু • বাতিঘর (বাংলাদেশ)

এই বিভাব কবিতার ধারণাটা অনেকটা আমার প্রস্তুতি, বলা যেতে পারে সম্পূরক হিসেবে আমার কাছে যখন উঠে এল, তখন আমি ভাবলাম যে এই শব্দটা পর্যাপ্ত কিনা!

মুখোমুখি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : বরুণ চট্টোপাধ্যায়

আপনার হাত ধরে, বলা ভালো, *যৌবনবাউল*-এর হাত ধরে বাংলা কাব্য ভুবনে 'বিভাব কবিতা' এল। *বোধশব্দ*-র এ সংখ্যার উপজীব্যই এই বিভাব কবিতা। কোনও সুনির্দিষ্ট একটি প্রশ্ন করে শুরু করতে চাইছি না — বরং শুরু করতে চাইব বিভাব কবিতা বিষয়ে আপনার অখণ্ড উপলব্ধি আজ ঠিক কেমন, সেটা সবিস্তার জানতে চেয়ে।

❑ ভাবতে খুব ভালো লাগছে যে আমি সন্তর্পণে কিংবা সংগোপনে একসময় যে একটি ধারণা কিংবা সংজ্ঞায়ন প্রবর্তন করতে চেয়েছিলাম, সেটি আজকে, অন্তত যাঁরা কবিতা নিয়ে কাজ করেন, যাঁরা কবিতার কর্মী তাঁদের মধ্যে একটা সানন্দ স্বীকৃতি পেয়েছে। অর্থাৎ এই, কবিতার বই-এর বা সংকলনের শুরুতে বিভাব, এই ধ্যান-ধারণার ব্যাপারটা। এখন সত্যের সৌজন্যে এটা স্বীকার করা ভালো যে একেবারে গোড়ার দিকেই, অর্থাৎ এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই *যৌবনবাউল*-এর কথাটা উঠেছে। আমি যে এই ধারণাটাকে খুব সংজ্ঞায়িত করে দিতে চেয়েছিলাম, এরকম বলা যাবে না। তার কারণ আমার মধ্যে একটা দ্বিধা ছিল, যে আমি যদি ওভাবে একটা জায়মান চিন্তনকে গেঁথে দিই তাহলে সেই দৃষ্টিকোণেই আমার কবিতাকে পাঠকজন মূল্যায়িত করতে থাকবে।

এতে বিপদটা এই যে বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে তর্জনী দিয়ে কোনও ভাবনাকেই চিহ্নিত করে দেওয়া যায় না। তাই যেহেতু *যৌবনবাউল*-এর কথাটা উঠেছে, সেই মানদণ্ডেই আমি বলি, যে, তখনও 'বিভাব' শব্দটাকে আমি বাজিয়ে দিইনি। এই ঘটনাটা ঘটল কিন্তু অনেক পরে; যখন আমার *ছৌ কাবুকির মুখোশ* বই-এর রিভিউ সূত্রে, যতদূর মনে পড়ে, ভাস্কর মুখোপাধ্যায় একটু সশ্রদ্ধ ভর্ৎসনার সুরেই বলে উঠেছিলেন — 'কোথায়! সমস্ত বইকে ধরে রাখা যায় এরকম একটা চিহ্ন কেন তিনি আমাদের বুনে দেননি। যেরকম তার আগের বইগুলোতে করছিলেন।' আগের বইগুলো অর্থাৎ তখন *নিষিদ্ধ কোজাগরী* বেরিয়ে গিয়েছিল। তা, এখন আমি বলা যায়, আমি আমার সতীর্থদের মধ্যে যাঁরা আমার সমকালীন, যাঁরা আমার পূর্বসূরি এবং যাঁরা আমার উত্তরসূরি আমি এঁদের সবাইকেই ধরে বলছি — তাঁরা যেসব কথা বলেন আমি আনম্র হয়ে সে-সমস্ত কথা বিবেচনা করি, অঙ্গীকার করে নিই। আমি এরপর থেকেই ভেবেছিলাম যে আমি 'বিভাব' শব্দটাকে ব্যবহার করব। অর্থাৎ যখনই বই-এর কোনও কবিতাক্রমের কথা আসছে, তখনই কিন্তু আমি বিভাব কবিতা বলে তাকে নির্নীত করে দিয়েছি। এবং আমি জানতাম যে এরও একটা বিপদ আরও আছে, যে কথাটা আমি গোড়ার দিকেই বললাম, সে বিপদটা হচ্ছে এই যে, আমি মিতকথনে একটা সূত্র রচনা করে দিতে চাইছি, সেটা দিয়ে হয়তো আমার এই বক্ষ্যমান বই-এর, গ্রন্থের, জরিপ-যাচাই হতে থাকবে।

মানে, ওই রবীন্দ্রনাথের কথায় যদি বলি, নামের আগে নকিবগিরি করতে পাঠান...

❑ একেবারে, খুব সুন্দর হয়েছে। এবং সে রবীন্দ্রনাথের কথা ধরেই বলছি — বড়োজোর নামকরণের একটা দিক আছে অনেকটা বৃন্তের মতন আভাসিত করে মাত্র। আমি এই জায়গা থেকেই শুরু করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাস্করের ওই কথাটা — এরকম মাঝে-মাঝে কথা বললে খুব ভালো হয় — ভাস্করের কথাটা আবার ভীষণ মনে ধরে গিয়েছিল, যে আমি যখন হাঁটছি, তখন একটা প্রস্থান-ভূমিকার একটা মন্ত্র গুঞ্জরিত করে দেওয়া ভালো। বড়োজোর এই পর্যন্তই। এর মধ্যে আমি যখন এই সব ভাবনাচিন্তা করছি, এই সময় থেকে আমি লক্ষ করছি কিন্তু এই ভাস্কর বা অন্যান্য যাঁরা, তাঁরা কিন্তু এরই মধ্যে আমার এই যে সমস্ত নির্মীয়মাণ, যে স্বগত চিন্তাগুলিকে তাঁরা প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং তাঁদের বইপত্রেও আমরা লক্ষ করছি বই-এর প্রথমে না হলেও মাঝখানে অথবা একেবারে শেষে তাঁরা এমন একটি কবিতা রাখছেন, যে কবিতাকে বিভাব কবিতা বলে শনাক্ত করা যেতে পারে।

এই হচ্ছে প্রাক ইতিহাস, বলা যেতে পারে। আমি এখানে আর একটা ভেতরকার কথা জানাতে চাই। এই বিভাব কবিতার ধারণাটা অনেকটা আমার প্রস্তুতি, বলা যেতে পারে সম্পূরক হিসেবে আমার কাছে যখন উঠে এল, তখন আমি ভাবলাম যে এই শব্দটা পর্যাপ্ত কিনা! এবং এই শব্দটার সঙ্গে আমার একটা স্বকেন্দ্রিকতা জড়িয়ে আছে, নাকি এমনও হতে পারে যে কবিতার আবহমান ইতিহাসে তার একটা কোনও পূর্বাঙ্কুর রয়ে গিয়েছিল।

এই সময়ে আমার মনে হয়, আমার পূর্বাচার্যরা আমাকে আশীর্বাদ করছেন। তাঁরা আমাকে বলছেন, তাঁরা যেন আমাকে বলতে চাইছেন যে, 'হ্যাঁ আমরা তোমার সঙ্গে আছি এই ব্যাপারে।' এবং আমাদের অলংকারশাস্ত্রের প্রথমতম ধারণা, কেন্দ্রীয় ধারণা যেটা, সেটা এই, বিভাব, যখন আমি লক্ষ করলাম, আনন্দবর্ধন কিংবা অভিনবগুপ্তের ভেতরে, তখন আমার মনে হল এটা একটা বীজমন্ত্র। আমি 'বীজমন্ত্র' কথাটা ব্যবহার করতে চাই এই সূত্রে। আমি বিশেষ করে অভিনবগুপ্তের কথা বলব। তিনি এই বীজমন্ত্রটা আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন বিভাব। এবং তিনি যখন দিয়েছেন, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রতীতি-প্রত্যয়, বিশ্বাস কিংবা ধর্মকে নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে আলাদা করে নিয়েছেন। এটা অদ্ভুত! তিনি ছিলেন শৈব। মনে আছে, হাজার কয়েক অনুব্রতীকে নিয়ে তিনি একটা গুহার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলেন। এই ঢুকে যাওয়াটার মধ্যে একটা অপূর্ব কবিতার রহস্য আছে। হ্যামলিনের সেই বাঁশিওয়ালার মতো। কিন্তু যখন তিনি ব্যক্তিগত জীবনের ধ্যান সাধনায় বৃত হয়েছেন, আর যখন তিনি কবিতার বিষয়ে লিখছেন, দুটোর মধ্যে তিনি কোনও একটা, একটা ত্বরান্বিত সমীকরণ করে নেননি। এই দুটো আলাদা। অর্থাৎ আমি যখন একেবারে শুরুতেই, যেমন ইউরোপীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যাকে ওভারটিওর বলা হচ্ছে, আমি যখন সুরটা ধরে দিচ্ছি, যেটা ভারতীয় সঙ্গীতের...

আলাপের...

❑ আলাপের মতো। একেবারেই আলাপের মতো। ওভারটিওরের মধ্যেও রয়েছে একটা মোটিফ। ধরে দেওয়া গেল। মোটিফ মিউজিক। কিন্তু ওটা ধরে, তারপর তাকে ঘিরে একেবারে প্রচণ্ডরকম খেলা। মানে, সে তাকে যে আঁকড়ে ধরে আছে, তা নয়। সেই যে আমার স্বরচিত একটা প্রস্তাবনাকে আমি আক্রমণ করছি মাঝে-মাঝে। এবং আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত একটা সমন্বয়ের দিকে আসবার চেষ্টা করছি।

মার্জনা করবেন। আপনি যখন বলছেন, মানে যেটা এই রেকর্ডিং যন্ত্রে ধরা পড়বে না। আপনার হাতের যে ভঙ্গিমাটি, এই যে কম্বুরেখা। এটার মধ্যে আমি কোথাও একটা বিস্তারকে দেখতে পেলাম। আলাপের পরে একটা বিস্তার। তার মানে, বিভাব কবিতা কি খানিকটা এইরকম? মানে, সে কি এসে বলতে পারে যে — আমার আত্মপরিচয়। মানে, আমি একটি সংকলনের প্রতিনিধি...

❑ সংকলনের প্রতিনিধি...

আমার বাড়ি উত্তরপাড়া।

❑ হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার বাড়ি উত্তরপাড়া...

আমি ছাত্র।

❑ হ্যাঁ, আমি ছাত্র...

এটুকুই আমার বিভাব...

শু এইটুকু খেই ধরিয়ে দেওয়া। তারপর অজ্ঞাতনাম হয়ে যাওয়া। তারপরে আমি সেই সময় যতটুকু জ্ঞাতকুলশীল ছিলাম, সেই চিহ্নরেখাকে মুছে দিয়ে পাঠকের সঙ্গে আমার খেলা শুরু হল। এবং সে একেবারে ঝুলন খেলা! রবীন্দ্রনাথের ভাষায়। আমি কিন্তু এটাই চেয়েছি। এবং সেইজন্য লক্ষ করবে তুমি, আমার একটা বই-এর একটা কবিতার সঙ্গে পরবর্তী কবিতার কোথাও কোনও সাদৃশ্য নেই। একটা বই-এর সঙ্গে পরের বই-এর কোনও সাদৃশ্য নেই। অনেকটা আড়বুননেতে খেলারও ব্যাপারটা আছে। এই বইতে আলোর কথা বলে পরের বইতে অন্ধকারের কথা বলে পরের বইতে আলো। এখনও লক্ষ করবে অনেকেরই, যাঁরা *যৌবনবাউল* পড়েনওনি, তাঁরা বলেন — *যৌবনবাউল*, তাহলে *যৌবনবাউল*! কারণ *যৌবনবাউল* বলতে মনে করছেন, আমি ওই যে বলছি — যে, আমি এরকমই মোটামুটি। আমি কেন ওইরকম মোটামুটি নেই — তারা ওই ধরে আমাকে একটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট, একটা চারিত্রিক-শংসাপত্র দিতে চান বা সেই নিরিখে আমাকে দেখতে চান। এই একটা ব্যাপারও আছে কিন্তু।

***যৌবনবাউল*-এর যেটি বিভাব কবিতা বলে চিহ্নিত, মানে, আপনার তো সবসময় হয়তো এমনটা মনে হয় না — *যৌবনবাউল*-এ যাকে আপনি বিভাব কবিতা বললেন, *নিষিদ্ধ কোজাগরী*-তে যাকে আপনি বিভাব কবিতা বললেন, পরবর্তীকালে তাকে আর তেমন নির্ভরযোগ্য মনে হল না।**

কিন্তু *যৌবনবাউল*-এর ক্ষেত্রে 'সঙ্গোপনে অলোকরঞ্জনা' — এখানে যে নিজের নাম কোথাও গ্রথিত করে দেন, স্বাক্ষরের মতো লাঞ্ছনার মতো এটা কিন্তু আর কোথাও দেখিনি। পরে আমি যখন বিশেষ করে, মূলত এই সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, *বিভাব* বলে যে স্বতন্ত্র কবিতাটি, রেমব্রাঁ-র ছবি প্রসঙ্গে, সেখানে আপনি 'ব্রহ্ম' কথাটি ব্যবহার করছেন। সত্তার আলোড়ন বিভাব। আপনার সমগ্র চেতনার সঙ্গে, মানে, ব্রহ্মকে যদি একটা মূলীভূত কারণ ধরি — বিভাব অর্থে কি কারণ, সমস্ত কিছুর কারণ, তাবৎ-এর কারণ? এই দুই-এর মধ্যে কোনও সঙ্গতি আছে আপনার মনে হয়? মানে, ম্যাক্রো এবং মাইক্রোর মধ্যে কোনও যোগ?

❑ ম্যাক্রোর মধ্যে সেটা অনেকটা এইরকমই হচ্ছে যে, ওই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আত্মপ্রতিবাদের ঐক্য। এইদিক থেকে। এটা একটা জায়গায় ব্রহ্মার স্বাদ দিচ্ছে, কিন্তু তার সহোদর। সে এক নয়, সেম, কোলরিজের ভাষায় সেম নয় সিমিলার। অর্থাৎ, এক নয় সদৃশ। সদৃশ মানে, যেমন দুই ভাই-এর মধ্যে মারাত্মকরকম সংগ্রামী ভালবাসা সত্ত্বেও ব্যবধান থাকে, সেই ব্যবধানটা অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার অস্মিতার যে বিচ্ছুরণ, সেই প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমাদের জীবনে যদি, হেরাক্লেটাসের কথা সত্য মানি, যে সমস্ত স্রোত, সমস্ত স্রোতোশ্চল, প্রত্যেক মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। এক জলে আমরা দু-বার স্নান করি না।

এইটাকে যদি না মানি, তাহলে আমাদের আত্মপরিচয়ের ব্যাপারটা বড়ো বিবর্ণ হয়ে যায়। কাজেই ব্রহ্মার স্বাদ, কিন্তু সহোদর। এই একটা ব্যাপার। এইদিক থেকে তোমার প্রশ্ন অসাধারণ আমার লাগছে।

বলছিলাম যে এই সূত্রে, 'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ'। আমার কিন্তু আমার নয়। একই সঙ্গে স্বীকৃতি এবং বিবিক্তি।

❑ ঠিক তাই। এবং এই জায়গাটাতে আমার নিজেকে নিয়েই একটা অতৃপ্তি আছে। আমার মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তির অভাব আছে। এই যে বললাম কথাগুলো, এগুলো ঘুরিয়ে বলা যাবে। এটা আর একটু ঘুরিয়ে বলা যাক, আর একটু ঘুরিয়ে বলা যাক। ঘুরিয়ে বলতে-বলতে-বলতে-বলতে... ক্যালাইডোস্কোপের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে একটা জায়গায় দেখা গেল — সেই তো সাদা, যে সমস্ত রং-গুলোকে ধরে আছে। প্রিজমগুলো। এই যে বর্ণালিগুলি ধরে আছে, সেইটা না জানলে যেকোনও একটি তত্ত্ব, এমনকী একটি কাব্যমীমাংসাও বড়ো নির্জীব হয়ে যায়। মনে হয়, মৃত হয়ে যায়। কবিতা তো জীবনকে নিয়েই আছাড়ি-পিছাড়ি খেলা। এই জায়গা থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে আমার মনে হয়, যে কবির কোনও ব্যাপারটা থাকে না। কবিতাই হয়ে ওঠে একেবারে পরিণামী পারমিতা। এটাই কিন্তু আমি চেয়েছিলাম।

এখানে একটা বিস্ময়কর তথ্য আমি দিচ্ছি। কিছুদিন আগে, প্রায়ই দেখতে পাই যে এই ব্যাপারটা বিশ্বকবিতার পরতে-পরতে রয়েছে। বিশ্বকবিদের পরতে-পরতে রয়েছে। একটি চিঠি আমি আবিষ্কার করি টি এস এলিয়টের। আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল, অবজেকটিভ কোরিলেটিভ যে ব্যাপারটা, এই যে আলম্বন বিভাব, যদি তার একটা অনুবাদ করি, বিষয়ী সম্পূরক। এটা তিনি আমার মনে হয়, আমাদের ধ্বন্যালোক ইত্যাদি থেকে নিয়েছেন। এবং সত্যিই তাই। এলিয়ট একটা চিঠিতে লিখছেন নিমাই চট্টোপাধ্যায়কে, যে ওই ব্যাপারটা আমি বিভাব থেকে নিয়েছিলাম। কেন যে কথাটা আবার মনে ধরে গেল। কেন এটা এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল, সেটা আমি আজও জানি না। ভারী সুন্দর একটা চিঠি! দেখা যাক, পরে তোমাদের কোনও একটা সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় কিনা। আমি চেষ্টা করব।

উনি কি ধ্বন্যালোকের নাম...

❑ না, নাম বলেননি। শুধু 'বিভাব' শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। তখন আমার মনে হল, এলিয়ট-এর আশীর্বাদ পেয়ে গেছি আর কী কথা! তখন থেকে আমার ভীষণ জোর বেড়ে গেল। আমি পরের যে বইটা করছি তার মধ্যে আমি একটা বিভাব নাটক, মানে, শুরুটাতেই একটা নাটক আমি রেখে দিয়েছি। কাব্যনাট্য। একটা জোর পেয়ে গেলাম। ভয়ঙ্কররকম একটা জোর পেয়ে গেলাম।

টাইটান...

❑ হ্যাঁ-হ্যাঁ, রিইনফোর্সড হলাম এবং সেখান থেকে আমার মনে হচ্ছে কী, যে আমরা যদি এইভাবে এগোই, আমি একটা ধ্রুবপদ বেঁধে নিলাম। তারপর ধ্রুবপদের উপযোগী যখন আমি হয়ে উঠছি, আমি সঙ্গে-সঙ্গে কিন্তু ক্ষর ব্রহ্ম হয়ে গেলাম, অক্ষর ব্রহ্ম রইলাম না। শেষ মুহূর্তে হয়তো আমি যখন ফিরছি, পাড়ে ফিরছি, সৈকতে ফিরছি, আমার একটা হাত সৈকতকে ছুঁয়ে দিয়েছে, তখন আমি কিন্তু সাঁতারের প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে চাইনি। আমি শুধু স্পর্শ করেছিলাম ধ্রুবপদকে। এই ধ্রুবপদের সঙ্গে আমার যদি চিরকালীন একটা ব্যবধান থাকে, এটা

বড়োই নান্দনিক। ওই চৈতন্যদেবের সেই কথার মতো — কয়েকলক্ষ বছর পরে ঈশ্বরকে পাব তো, ব্যাস, আর কিছু দরকার নেই! অক্ষরের মতো সত্যবান আর প্রতারক কিছু নেই। আমি এখান থেকে বলছি যেমন — ওটা দাঁড়িয়ে গেল, ক্ষরিত হচ্ছে না। এই তো, হচ্ছে তো। এভাবে বলা হচ্ছে কথাটাকে। বলা হচ্ছে। কিন্তু অক্ষর তো ক্ষরিত হচ্ছে। 'আখর' শব্দটা অক্ষর থেকে এসেছে কীর্তনের। এবং লক্ষ করা যায়, আমরা যখন বলরামদাসের, জ্ঞানদাসের একটা পদকে, কিংবা আরও পিছিয়ে গিয়ে বিদ্যাপতির একটা পদকে পড়ছি, তখন অসম্ভব স্বাধীনতা নিচ্ছি। আমি সুর বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে, থিমের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা নিচ্ছি। যদি আমি স্বাধীনতা না নিতে পারি, আমি মানুষ কীসের? মানুষ তো সবসময়, এমনকী কোনও কবিরও কর্তৃত্ব মানবে না। এবং সেই জায়গায় আমি সরে যাচ্ছি বারবার। এই যে সরে যাবার স্বাধীনতাটি যতক্ষণ থাকছে, একটা এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারছি। তাহলেই তো হল আমার সব। এই জায়গা থেকেই কিন্তু আমি পুরো ব্যাপারটাকে ধরবার চেষ্টা করছি। সেইজন্য অনেক সময় দেখা যায়, যাঁরা সংবেদী পাঠক তোমার মতো, ধরতে পারবে, একটা বই-এর দ্বিতীয়, তৃতীয় পর্যায় থেকে কিন্তু আরও কয়েকটা বিভাব এসে অনুস্যূত হয়েছে। আমি আগে যেমন কোনও-কোনও বই-এ আলাদা পর্যায় করে দিয়েছি। এখন আর করছি না। কারণ, পাঠক তো কবি।

অন্তত পাঠের মুহূর্তে তো, কবি।

❑ শুধু তাই নয়, যেমন ডিয়ুই-এর কথাটা যে — 'পাঠক কবি। আমি তো কবিদের জন্যই, কবিদের জন্য মানে বলছি যে, লিখছেন না হয়তো, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেক বড়ো কবি প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন, এই প্রচ্ছন্ন পাঠককে কবি অভিধায় টেনে আনা, সেটা আমার একটা কাজ। সেইজন্য ব্যাখ্যার কোনও ব্যাপার...

এই 'ব্যাখ্যা' কথাটা... আপনি বলছিলেন...

❑ আমি বলছি, আমি বলছি। এই জায়গায় আমি একটি ভরসা পেয়ে গেছিলাম, আমি যখন *রাইম অফ দি এনসিয়েন্ট মেরিনার* আবার নতুন করে অনুবাদ করি। আমি এইটার প্রথম অনুবাদ করি আমার বন্ধু শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে। তখনও আমি জানতাম না, এই কবিতাটাকে বহুবার রচনা করেছিলেন কোলরিজ। তারপরে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এটা যখন বই হিসেবে প্রকাশ করতে চাইলেন, তখন নানানরকম খসড়াগুলো দেখি। দেখতে-দেখতে এক জায়গায় দেখি, লক্ষ করি, যে এই কবিতাটার শুরুতেই ল্যাটিন ভাষায় কোলরিজ একটি প্রাক-প্রস্তাবনা লিখেছেন। অর্থাৎ, বিভাব। সেই বিভাবের সঙ্গে জড়িয়ে যদি কবিতাটা দেখি, তার কোনওরকম প্রতিবিম্বন নেই কিন্তু কবিতাটার মধ্যে। অনেকটা আবহসঙ্গীতের মতো। কীরকম! খেয়াল রাখো, কবি নিজেকে বলছেন — তুমি যেন কখনও, কখনও তুমি যেন, দিন আর রাত্রের মধ্যে একটা তফাত আছে, সেটা ভুলে যেও না। একটু তফাত আছে কিন্তু। এই বিভাজন রেখাটাকে শ্রদ্ধা কোরো, না হলে তুমি উন্মাদ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটার তো কোনও সরাসরি প্রতিচ্ছায়া নেই এই ব্যালাডের মধ্যে, কিন্তু হ্যাঁ, তাই তো বুড়ো নাবিক, সে ভুলে গিয়েছিল দিন আর রাত্রির মধ্যে তফাত। সে তো ভুলে গেছিল পাপ আর পুণ্যের মধ্যে তফাত। এইভাবে যদি দেখি, তাহলে বুঝতে পারি, কবির কাজ তল-ডুবুরি হওয়া। তাই যদি হয়, যদি তল-ডুবুরি হওয়াটা তাঁর কাজ হয়, তিনি শুধু ধরিয়ে দেবেন। আমাদের মার্গসঙ্গীতে পকড়। যেমন, আরোহে এই কয়েকটা সুর থাকবেই। আর, অবরোহে এই।

এবারে তুমি তোমার মতো...

❑ এবারে তুমি তোমার মতো করে করো। এই কারণেই দেখা যায় যে লোকসঙ্গীতের মতনই রাগ সঙ্গীত কখনও পুনরাবৃত্ত হয় না। প্রত্যেক মুহূর্তে আলাদা হয়। আমি এটা পরীক্ষা করার জন্যই করলাম। এবার ইউরোপে রবীন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে আনার কাজে আমিও ছিলাম নিবেদিত একজন। একদিন কেরালার একটি নর্তকীকে বললাম — দেখো, তুমি কথকে তুলে নাও তো রবীন্দ্রনাথের *কালো ঘোড়া* কবিতাটা, আমি অনুবাদ করলাম, তুলে নাও তো। তুলে নিল। তখন দেখলাম, শাস্ত্রীয় নৃত্যের মতো আধুনিক আর কিছু নেই। যেন মনে হল যে আরেকটা ভাষ্য, *কালো ঘোড়া*-র আমার হাত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তারপর সংশোধন করে দিলেন। এই যে ব্যাপারটা, তার থেকে এখন এইটুকুই আমি বলতে চাইছি, আমরা বিভাবের কাছে যেটা চাইব, যে, একসঙ্গে স্বাধিকার — কবির স্বাধিকার এবং পাঠকের সঙ্গে তার যে মৈত্রী সংহতি, সলিডারিটি, তার সমাচার — এই দুটোই আমরা চাইব।

এমনি কথার সূত্রে অনুষঙ্গ তো বিভিন্নভাবে আসে, আমার মনে হচ্ছিল, সভাপর্বের কথা। মহাভারতের সভাপর্বের কথা। আমি এটা বহুবার ভেবেছি, আজ এই মুহূর্তে কেন মনে হল...

❑ কেন বলো...

আপনি যখন বৃদ্ধ নাবিকের কথা বললেন, তখন মনে হল। মানে ওই মুহূর্তের একটা তরঙ্গ। উনি হঠাৎ পাদ্য-অর্ঘ দেবার দায়িত্ব নিচ্ছেন। যা, আমার ভূমিকা ওইটুকুই, আমি ভেতরে যাব না।

❑ আমার মনে আছে। হ্যাঁ, মনে আছে।

মানে সেই ভূমিকাটা। কৃষ্ণের তখন ঐশ্বর্যরূপ...

❑ হ্যাঁ, মনে আছে। তুমি খুব ভালো জায়গায় ধরেছ।

তিনি তারপর ওইভাবে বিনত হলেন। জরাসন্ধের মীমাংসা হয়ে গেছে। এরপর হবে শিশুপাল বধ। তার মাঝখানে হঠাৎ এই বিনতি এবং রাজসূয় যজ্ঞে প্রত্যেককে আহ্বান করা। অর্থাৎ একইসঙ্গে অস্মিতা ও বিনয়।

❑ অস্মিতা এবং বিনয় একইসঙ্গে। কালিদাসের বর্ণনা আছে, স্বয়ম্বর সভায় যাদের নির্বাচন করা হচ্ছে না, তাদের প্রণিপাত করে সরে যাওয়া। সুতরাং এই যে ব্যাপারটা এবং আমার মনে হয় যে অ্যাম্বিভ্যালেন্স, কবিতার মধ্যে যদি অ্যাম্বিভ্যালেন্স না থাকে, কবিতার মধ্যে যদি প্রতীপসম্মিতি না থাকে, সেই কবিতার কাছে আমরা দ্বিতীয়বার ফিরি না।

সেই মানুষের কাছেও ফিরি না।

❑ সেই মানুষের কাছেও ফিরি না। সুতরাং এই জায়গাটা, হুইটম্যান বলছেন — 'আমি কি আমার কথার প্রতিবাদ করলাম? বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলাম? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করলাম। কারণ, আই কনটেইন মাল্টিচিউডস'। আমার মধ্যে অনেকগুলি অণুবিশ্ব ছড়িয়ে আছে। এবং আমি এটা বলছি যে, কবিতাই বোধহয় নশ্বরতা এবং অমরতার মধ্যে একটা সেতু। এবং একেবারে ক্ষণ মুহূর্তের সঙ্গে, সত্যিই বলছি, পুরোনো কথা, আবার অনন্তের একটা সেতু ছুঁড়ে দেয়। কবিতার মতন প্রগতিশীলিত মাধ্যম আর নেই। ছবি যিনি আঁকেন তার থেকেও আরও করুণ দশা ভাস্কর্যের। একটা জায়গায় রাখা। রেখে দেখা। তাকে প্রস্তরিত করে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার একটা ব্যাপার। এই জায়গা থেকে কবিতার যে অ্যাম্বিভ্যালেন্স, কবিতার যে প্রতীপসাম্য, সেটা অনেক বেশি। কারণ কবিতার প্রত্যেকটা অক্ষরই ক্ষর ব্রহ্ম এবং অক্ষর ব্রহ্ম।

***বোধশব্দ* পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যার অনুমেয় পাঠকদের জন্য বহু অপ্রত্যাশিত ও অপ্রকাশিত উপলব্ধির ইশারা তো রইলই আমাদের এই কথোপকথনে। হয়তো আপনিও, আজ ফিরে তাকাতে গিয়ে নতুন করে পেলেন আরও নতুন কিছু। একটা প্রকরণগত প্রশ্ন বাকি আছে। কবিতার বই-এর প্রচ্ছদও তো তার একটা প্রাথমিক মুখশ্রী। সমগ্র সংকলনের আত্মপরিচয়ের আভাস। *যৌবনবাউল*-এর প্রচ্ছদ সম্পর্কে কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন আপনি...**

❑ হ্যাঁ। প্রচ্ছদটা করেছিলেন মাখনলাল দত্তগুপ্ত। অন্য কোনও নির্দেশ নয়, আমি শুধু একটা অমূর্ত প্রচ্ছদ চেয়েছিলাম শিল্পীর কাছে।

ভূমিকার মজা হচ্ছে যে — যদিও বলা হয় ভূমিকা, কিন্তু লেখকরা সেটা লেখেন গোটা বইটা লেখা হয়ে যাওয়ার পর! সুতরাং একধরনের প্রতারণার ব্যাপারও আছে।

মুখোমুখি উৎপলকুমার বসু

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : রাজদীপ রায়

আমাদের সংখ্যার বিষয় যেহেতু 'বিভাব কবিতা' এবং পাঠক হিসেবে এ-ও লক্ষ করে আসছি, আপনার বইগুলিতে বিভাব কবিতার একটা অন্যতম তাৎপর্য রয়েছে; সেগুলোর ওপরেই যদি কিছু কথা যা একান্ত আপনার, ভাগ করে নেন আমাদের সঙ্গে...

□ হ্যাঁ, কিন্তু এই 'বিভাব' শব্দটার সঙ্গে..., এর মানে আমি জানি না, তবে *বিভাব* নামে একটা কাগজ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত বার করতেন। এখনও বেরোবে, ছেলেরা বলে। চলে গেছেন... 'বিভাব' মানে আমি যতদূর জানি একটা উদ্দীপন, উৎসাহ... মূলত এসব অর্থেই 'বিভাব' কথাটা ব্যবহৃত হয়।

আলংকারিকদের দিক থেকে যে বিভাব-অনুভাবের বিষয়টি ছিল...

□ সেটা হতে পারে, আর আরেকটা হতে পারে যে... ভূমিকা... অনেক খাটো করে আনলে সেই সম্বন্ধে...

এই যে আপনার বিভিন্ন পুস্তক ও পুস্তিকায় বিভাব কবিতা পড়ি, আপনি যখন প্রথম লেখালেখি শুরু করলেন, একটা প্রাথমিক অনুপ্রেরণা হিসেবে কি কিছু কাজ করেছিল?

□ এতদিনে তা আর মনে নেই। তবে কবিতায় যদি উৎসর্গ বা ভূমিকা এরকম কিছু একটা থাকে..., ভূমিকার মজা হচ্ছে যে — যদিও বলা হয় ভূমিকা, কিন্তু লেখকরা সেটা লেখেন গোটা বইটা লেখা হয়ে যাওয়ার পর! সুতরাং একধরনের প্রতারণার ব্যাপারও আছে। আগে কেউ ভূমিকা লিখে তারপর বই লেখেন না। কিন্তু সেরকমই একটা ভাব দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে 'ভূমিকা' শব্দটা ব্যবহার না করে... মানে... বই করা প্রায় কবিতা লেখার মতোই একটা জটিল প্রক্রিয়া। জটিল অতৃপ্তিকর কাজ। সবসময়েই মনে হয় এটা ঠিক হল না। এখানটা এই বললে ভালো হত।

এই অতৃপ্তির জায়গাটাই কি একজন স্রষ্টার কাছে কাম্য?

□ হ্যাঁ সেটাই তো স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তবে একটা নতুন কবিতার বই-এর কালেকশন করা আর কবিতাসংগ্রহ, মানে যা হয়ে গেছে তা জড়ো করা, এই দুটো আলাদা। শেষেরটা তেমন কঠিন কাজ নয়। কঠিন কাজ হচ্ছে একটা নতুন বই বের করা। যেটা প্রায় কবিতা লেখার মতোই অতৃপ্তিকর কাজ। এখানটা ঠিক হল না, ওই লেখাটা এর আগে এলে ভালো হত... এমনকী বই হয়ে যাওয়ার পরেও মনে হয়, এই লেখাটা কেন পরে বা আগে দিলাম, কারণ কী? খানিকটা, ইংরাজিতে যাকে বলে নস্টালজিয়া, বা স্মৃতি উদ্রেককারী...

তার মানে ব্যাপারটা কি আপেক্ষিক? বদলে যায় সময়ের সঙ্গে?

□ অবশ্যই, বদলায়, [illegible] প্রায়-সময়তেই বদলায়, কিন্তু আমরা আর ওই পুরোনো বই-এর দিকে তাকাই না। সামনের দিকে তাকানোই তো ভালো...

এই যে আপনি বললেন উৎসর্গের কবিতা বা ভূমিকার কথা, আপনার বইতে উৎসর্গ থাকে, বিভাব থাকে, আবার ভূমিকাও থাকে — তাহলে বিভাব কবিতা হিসেবে কোনটাকে আমরা ধরব? বিভাব কবিতাকেই কি আপনি 'উৎসর্গ' বা 'ভূমিকা' বলছেন, না অন্য কোনও ভাবনা কাজ করছে এর মধ্যে?

□ ভূমিকা অনেকসময় করার দরকার হয়, যেমন কবিতা সংগ্রহে। এগুলো বৈষয়িক আর কী... কীভাবে সংগ্রহটা হল... না হল...

কিন্তু আপনার একাধিক পুস্তিকাতেও ভূমিকা শিরোনামে কবিতাই রয়েছে...

□ তা থাকে...

আবার অনেক সময় উৎসর্গ হিসেবেও থাকে।

□ আসলে লেখা সংগ্রহ করার পর যখন ফাইনালি দেখি, তখনই ওটা লিখতে ইচ্ছে করে। বিভাব, ভূমিকা বা উৎসর্গ প্রত্যেকটির আলাদা অ্যাপ্রোচ থাকে, যখন 'ভূমিকা' বলছি, গদ্যের বই-এর হতে পারে, প্রবন্ধের বই-এর হতে পারে, আর বাকি যা 'উৎসর্গ', তা সাধারণত ব্যক্তিবিশেষকে বা তার সমসাময়িক কোনও ঘটনাকে এইভাবে গড়ে তোলে। 'উৎসর্গ' মানে সেই সময়টার কথা বলে, কাব্য আকারে লেখা। আর 'বিভাব' বলতে গোটা বই-এর যে ভাব রয়েছে, সেটাকে একটা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা।

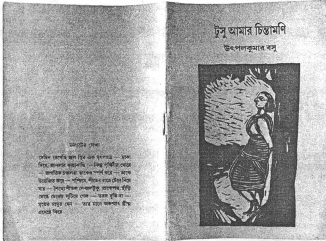
ধরুন, কোনও তরুণ তার বই করতে চলেছেন, তাহলে সেক্ষেত্রে বিভাব কবিতা থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ?

□ গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই। যাঁদের বইতে থাকে না, তাঁদের এ বিষয়টা তত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। কিংবা হয়তো... আসলে কবিতার বই বের করাটা একটা জটিল ব্যাপার। সেটা যে কবি তাঁর ইচ্ছায় সম্পূর্ণটা করছেন, তা না-ও হতে পারে। প্রকাশকের ইচ্ছে থাকে। কবিতাসংগ্রহ বা শ্রেষ্ঠ কবিতা যারা বার করেন সেক্ষেত্রে প্রকাশকের ইচ্ছে একটা বড়ো ব্যাপার। অবশ্যই আমার ক্ষেত্রে নয় সেটা। লিটল ম্যাগাজিন বা বড়ো প্রকাশকও যখন আসেন, তখন তাঁরা আমার হাতেই সমস্তটা ছেড়ে দেন। কিন্তু নতুন কবিদের ক্ষেত্রে তো তা হবে না। আমি, প্রথম বই থেকেই একটু দুর্বিনীত বলে এসব নিয়মকানুন মানিনি!

আরেকটা বিষয় চোখে পড়ে আপনার গ্রন্থনির্মাণে, তা হল মলাটের লেখা...

□ মলাটের লেখাও অনেকটা ওই বিভাবের মতোই। মলাটের লেখা... আমার নিজের একটা মনে হয় যে, এই চতুর্থ পৃষ্ঠায় এতটা জায়গা ফাঁকা যাবে? একটা লেখা যাওয়া উচিত। এখন সমস্যা হচ্ছে, কী লেখা যাবে? আমরা ধরেনি পাঠক প্রথম থেকে শুরু করে চতুর্থ মলাটে যাচ্ছে। তখন পাঠ শেষ করার আগে কবি কী বলছেন পাঠককে? সেইটাই আশা করা হয়, কিন্তু কোনও পাঠক হয়তো প্রথম পাতা থেকেই শেষ পাতায় চলে গেল...

খুব মনে পড়ছে *টুসু আমার চিন্তামণি*-র কথা। আচ্ছা, তাহলে বিভাব কবিতা কোন বইতে রয়েছে, কোন বইতে নেই — পুরোটাই নির্ভর করবে কবির প্রয়োজন ও ব্যক্তিগত অভিরুচির ওপর?



❑ যখন বইটা করা হয়েছে, সেই সময়ে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কবি, যিনি ক্রমাগত পালটান। এটা একটা ডায়নামিক প্রতিক্রিয়া, পরিবর্তনশীল প্রতিক্রিয়া। এই পর্যন্ত। তারপর কবি যখন থাকবেন না, তখন ব্যাপারটা অন্যের হাতে...

এবার আপনার বই-এর প্রসঙ্গে আসি, *চৈত্রে রচিত কবিতা*-এ একটা প্রেমমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি পাচ্ছি, যেটা খুবই ব্যক্তিগত। *পুরী সিরিজ*-এর উৎসর্গ কবিতাতেই তার জায়গায় আসছে সংবদ্ধ শ্রমিক-উচ্ছ্বাস, কলকাতার তাঁতকলের ছবি পাচ্ছে পাঠক।

❑ সে তো এতদিন আগের ব্যাপার। কেন এই উত্তরণ বা পরিবর্তন, সে তো আর আমি বলতে পারব না, তা সমালোচকরা বলতে পারেন। আমি লিখেই খালাস! কবি লিখেই খালাস!

লক্ষ্যণীয় এটাই, ভূমিকায় যে সংবদ্ধ জীবন পাচ্ছি, পুস্তিকার ভেতরে তাই অতিব্যক্তিগত গভীর হয়ে উঠছে, সমবেত থেকে পার্সোনাল হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এই ভূমিকা নির্মাণ কি কনট্রাস্ট তৈরির জন্যেই?

❑ যদিও *পুরী সিরিজ* নাম দেওয়া, তবুও এটা আমার সম্বন্ধে কেউ-কেউ লিখেছেন যে, সমুদ্রে আমার কোনও ইনটারেস্ট নেই। আমার ইনটারেস্ট সৈকতে। যেখানে লোকে যায়, বেড়াতে, ছেলেমেয়ে, পরিবার নিয়ে যায়, বাচ্চারা সৈকতে খেলা করে, ইত্যাদি। এই জগৎটা আমার কাছে আকর্ষণীয়।

যেখানে মানুষ যেতে পারে...

❑ মানুষ যেতে পারে, হলিডে করতে, সপরিবারে। সেই জায়গাগুলো আমার ইনটারেস্টের। আমার ওই সমুদ্রে ঝড় হল, জাহাজডুবি হল, এসবে ইনটারেস্ট নেই।

আমরা বলি মানুষ সমুদ্রে বেড়াতে যায়, কিন্তু আসলে তো সমুদ্রে যায় না, যায় সৈকতে...

❑ হ্যাঁ, তাই তো। সৈকতেই যায়। সমুদ্রকে সে দেখে দূর থেকে। সেখানে নানারকম প্রেম হয়, বিচ্ছেদ হয়, স্নান করে... এতেই আমার আগ্রহ।

যখন ভূমিকা কবিতাগুলো পড়ছিলাম এবং বইগুলো পড়ে দেখছিলাম, আবার *পুরী সিরিজ*-এর উৎসর্গ কবিতার সঙ্গে *চৈত্রে রচিত কবিতা*-র *কেবল পাতার শব্দে* কবিতার আশ্চর্য মিল। তাহলে কি কখনও এমনটা হয়, কোনও উৎসর্গ কবিতা সময়ের আগেই আপনি পেয়ে গিয়েছিলেন?

❑ তা হতে পারে। আবার এ-ও হতে পারে, আমি যখন সাজাচ্ছি, তখন আগের কোনও লেখাকে মনে হতে পারে এই জায়গায় যাবে। এখানকার উপযুক্ত। সেরকম হতেই পারে। এই উত্তরণগুলোও খুব ডায়নামিক। ডায়নামিক এই অর্থে, যে সদাপরিবর্তনশীল। যেমন এই সেদিন একজন আমার সম্পর্কে বললেন 'সদাভ্রাম্যমান'। সদাভ্রাম্যমান যে, তার লেখাও সদাপরিবর্তনশীল। এইজন্য ভাষা বদলায়। কত বাইরে থেকে জিনিস এসে পড়ে, যাদের সঙ্গে খাচ্ছি, ঘুরছি, তাদের ভাষা। জীবনানন্দ বলেছিলেন, 'মানুষ মরে যায় তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়' — রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'মরণ হতে যেন জাগি, গানের সুরে' — আমার দীন প্রার্থনা হচ্ছে, যখন লোকাল ট্রেনে যাই লোকজনের চিৎকারে, ঝগড়ায়, সিট বাছাবাছিতে... ভয়ঙ্করভাবে জীবন পাই। দৈনন্দিন জীবনের বাইরে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। সেজন্য আমার লেখায় কোনও বৃহৎ উচ্চমার্গীয় চিন্তা নেই, দার্শনিক চিন্তা নেই। অনেকে বলেন, আমি আত্মজীবনী লিখি না। আমার বক্তব্য, আমি যা লিখি, সেটাই আমার আত্মজীবনী। আলাদা করে কিছু বলার নেই আমার। আত্মজীবনীর মধ্যে শুধু আমি থাকবো, আর কেউ থাকবে না, তখন আত্মজীবনী তো হয় না, সকলকে মিলিয়েই আমি।

সকলকে মিলিয়ে নেওয়ার এই তাগিদ থেকেই কি কথ্য ভাষা, মুখের ভাষা, আপনার কবিতায় শরীর পায়? এই যেমন 'এশ্চিস্' বা 'এসিসনি', 'এদ্দূর', 'এশ্চেন', 'ব্যারাম' — আবার উত্তর কলকাতার কোনও ডায়ালেক্ট ধারণ করে আপনার কবিতা। মানুষের সঙ্গে মিশে থাকতে চাওয়ার কারণেই কি এই ভাষা অনায়াসে চলে আসে?

❑ কে যেন একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলেছিলেন, ভাষাই হচ্ছে আমাদের শেষ অবলম্বন। সেরকম আমি যখন এগুলো ব্যবহার করি, তখন শেষ অবলম্বন হিসেবেই ব্যবহার করি। এটাই আমায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঠেলে দেয়। নিজেকে প্রকাশিত করার যে স্পৃহা, সেটা পরিস্ফুট হয় আর কী। এভাবেই প্রকাশিত হতে চাইছে এগুলো।

তাহলে ভাষা মানে নিজের ব্যক্তিগত ভাষা নয়?

❑ না-না, আমার নিজের কোনও ব্যক্তিগত ভাষা আছে কি না, তাতেই আমার সন্দেহ। আমি যে ভাষা ব্যবহার করি, ইংরাজিতে যাকে বলে কনস্ট্রাক্ট। সেটা ট্রেনের ভাষা, বাসের ভাষা, বাজারের ভাষা। সব মিলিয়েই যে কনস্ট্রাক্ট, সেটাই হচ্ছে আমার ভাষা। এতে আমার কোনও কৃতিত্ব আছে বলে আমি দাবি করি না। যদি কোনও কৃতিত্ব থেকে থাকে, তাহলে এটাই, যে আমি লিখে ফেলেছি। এর পেছনে কোনও নৈতিক দায়িত্ব, রাজনৈতিক দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব — এসব কিছু নেই! যা শুনছি, তাই আমি লিখে যাচ্ছি। এর কুফলও আছে। সুফলও আছে। এর মধ্যে যদি গভীরভাবে নিজের কিছু থাকে, সেটা হয়তো স্মৃতি। ভয়ঙ্কর স্মৃতি তাড়িত করে। ভাষা তো আজকের দিনের নয়, যেমন ছেলেবেলায় যখন খেলাধুলা করে মাঠ থেকে ফিরতাম, তখন মা বলতেন, 'পড়তে বস', সে গলা তো এখনও আমি শুনতে পাই! এই 'হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বস' — এটা আমার কাছে আতঙ্কজনক এক্সপ্রেশন! তখনও ছিল, এখনও আছে। আমি মধ্যে-মধ্যে দুপুরবেলা এরকম সব গলা শুনি।

সেটাই আপনার ভাষা...

❑ সেটাই আমার ভাষা নয়, সেটা অন্য কারো ভাষা, কিন্তু কী করে আমার মধ্যে রয়ে গেছে। যেমন আমার রক্তটা যে আমার রক্ত, সেটা কে বলল? সেটা তো আমার বংশ-পরম্পরা, আমার বড়ো হয়ে ওঠা, যেভাবে যেখানে বড়ো হয়েছি, সব মিলিয়ে যে আমি সেই কনস্ট্রাক্ট-টার কথাই বলতে চাইছি। সেখানে নিজের বলতে অ্যাজ সাচ কিছু নেই। আমি যে বয়সে এসে পৌঁছেছি, বলতে পারি মেমরির বিরাট একটা ভূমিকা কাজ করে। যদি কারো ভূমিকা থেকে থাকে, সেটা হচ্ছে স্মৃতির ভূমিকা। সেদিনও একজন বলছিলেন, তাছাড়া দার্শনিক চিন্তায় তেমন উৎসাহিত নই। অক্ষমতা হয়তো। বড়ো-বড়ো চিন্তা থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তা আর হয়নি, কী করা যাবে!

আপনি বলছেন স্মৃতির ভূমিকার কথা। আবার *কবিতাসংগ্রহ*-এর ভূমিকায় বলেছেন, 'তাও তো ঠুনকো'।

❑ কিন্তু সমবায়িক স্মৃতির ভূমিকাও তো আছে। কালেকটিভ আনকনশাস বা অবচেতন মনে এমন স্মৃতি লুকোনো আছে... আমার সঙ্গে হয়তো তার প্রত্যক্ষ যোগ নেই, কিন্তু অনেক জায়গায় গেলেই মনে হয় না, আগে এখানে এসেছি। এত বিশ্বাসযোগ্য ভাবে হয়! এটা যে মিথ্যে বা কল্পনা করে বলছি, কিংবা ধরা যাক ইছাপুরেই গিয়ে আমার মনে হল আমি এখানে আগে এসেছি, হয়তো এসেছি! এটা কালেক্টিভ আনকনশাসনেস। মরুভূমির মধ্যে গেছি আমি রাজস্থানের ওইদিকে, জয়সলমীরে। বড়ো-বড়ো তাঁবুতে। রাত্রিতে বৃষ্টি শুরু হল, সকলে তো অবাক! বলে, আমাদের এখানে কোনওদিন বৃষ্টি হয় না। উটগুলোও বালির ওপর ঘাড় গুঁজে... ওরাও বোধহয় বৃষ্টি দ্যাখেনি কোনওদিন, সবাই অবশ্য আমাকে বকাবকি শুরু করল, এই বাঙালিবাবু বৃষ্টি নিয়ে এসেছেন — এই বলে! কিন্তু বৃষ্টি তো হল। তারপর তো ভোরও হল। তাঁবুর মধ্যে তখনও বসে... এই যে ঘুরেছি নানা জায়গায় এবং সদাভ্রাম্যমান — এটাই বহু স্মৃতি, বহু উদ্দীপক, যা আমার, যা কালেকটিভ, যা পারিবারিক স্মৃতি — সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত।

তাহলে এটা আপনার কবিজীবনের বিভাব বলা যেতে পারে।

❑ একদম। ঠিকই। এবং আমি কবিতা লেখা ছাড়া আর কোনও কাজ ঠিকঠাক করতে পারি না, কবিতা লিখতে বসলে তখন আমি দুর্দমনীয় বলা যেতে পারে! কাটাকুটি হয়। কবিতা বদলায়। ভয়ঙ্কর বদলায়। প্রকাশিত লেখাগুলোই তো পালটাতে ইচ্ছে করে।

সে কারণেই দেখি 'মাতৃকা মেরী' হয়ে উঠছে 'মা', আর 'অকস্মাৎ কোনও শব্দে' হয়ে উঠছে 'মায়ের হাসির শব্দে'? আবার *বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে*-র একটি কবিতা আপনার সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ *পিয়া মন ভাবে*-তে স্থান পেয়েছে, সেখানে 'পদ্মসায়র' হয়েছে 'দণ্ডসারস'।

❑ নানারকম, ওরিজিনালি আছে 'দণ্ডসারস'। ওটাকে আমি করলাম 'পদ্মসায়র'। আবার ফিরে গিয়ে 'দণ্ডসারস'। সারাক্ষণ কবিতার সঙ্গে এই দেওয়া-নেওয়া চলছে। কার কথা শুনেছি কোথায়? স্মৃতির মধ্যে ভাষা সৃষ্টি হচ্ছে...

বিভাবও শাশ্বত নয়, পরিবর্তনশীল? মেরি যখন 'মা' হন, তাতে সর্বজয়াও চলে আসে।

❑ অবশ্যই। সর্বজয়া আসে। আর যে পড়ছে সে-ও তার মাকে খুঁজে পায়। অনেকসময় এই ব্যক্তিবিশেষ এইভাবে নিজের হয়ে ওঠে।

আপনার প্রথম জীবনে প্রকাশিত বইগুলো আমরা হাতে পাইনি, কবিতাসংগ্রহই এসেছে। সেখানে আপনার *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-এ দেখি উৎসর্গ কবিতাও রয়েছে, আবার ভূমিকাও রয়েছে একাদিক্রমে। উৎসর্গ আর ভূমিকার এই সহাবস্থান কেন?

❑ আসলে *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র আগে যে বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে, তার কবিতাগুলোই নিয়ে *শ্রেষ্ঠ কবিতা* তো? ধরো, তিন নম্বর কবিতা উৎসর্গ হওয়ার মতো, আবার পাঁচ নম্বরটাও তাই। তখন লিখতে হয় তৃতীয় বই-এর উৎসর্গ কবিতা, পঞ্চম বই-এর উৎসর্গ কবিতা। তাহলে আর নতুন করে নামকরণের দরকার হয় না। এটা কেউ স্বতন্ত্র হিসেবেও পড়তে পারে আবার উৎসর্গ হিসেবেও পড়তে পারে। সংগ্রহে একাধিক ভূমিকা থাকতেই পারে।

স্মরণ

পদ্মপাতা উলটে যাচ্ছে জলে।
তুমি আমার অধিক কথা-বলা
মায়ের মতো নেমেছ পল্বলে —
সারা জগৎ তোমার কথাই বলে।

উৎকেন্দ্রিক কাব্যে যাবে পাওয়া
পুকুরঘাট, ভিজে বনের তলা,
দুপুরবেলার ব্যবস্থাহীন খাওয়া
দণ্ডসারস উলটে-দেওয়া হাওয়া।

মহাজীবন, তুমি ওদের খাতা,
ওই পিঁপড়েদের, পতঙ্গদের চলা,
পায়ের ছাপে ভরিয়ে-তোলা পাতা —
মলমূত্রের বিন্দুবিসর্গতা।

আজ বৃষ্টিজলে ধুয়ে যাচ্ছে বন।
শুনতে পাই মানুষজনের গলা —
আকাশজুড়ে মেঘের গর্জন,
স্মরণাতীত, তুমি আমার স্মরণ।

পিয়া মন ভাবে, উৎপলকুমার বসু

অনেকে যখন লিখতে থাকেন, তখন একটা প্রথা আপনিই তৈরি হয়ে যায়। আপনার উৎসর্গ বা ভূমিকা শিরোনামহীন। কিন্তু আপনার সাম্প্রতিকতম বইতে সামনের কবিতাটির নাম রয়েছে (*স্মরণ*), একে কী বলবেন? বিভাব না উৎসর্গ?

❑ স্মরণ মানে কী, এখন আমি বুঝতে পারি। অনেক কবিতা থাকে বিভাব বলি বা উৎসর্গ, আসলে বিস্মৃতি। সুতরাং অন্যান্য সব অতিরিক্ত বাদ দিয়ে একে স্মৃতি বলে দেওয়াই ভালো। ওই যে 'পদ্মপাতা উল্টে যাচ্ছে জলে'... বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতি আর কী।

***সলমা জরির কাজ*-এর উৎসর্গপত্রের পাণ্ডুলিপিতে কবিতার ওপরে 'কহবতীর নাচ' এই শিরোনামটি লেখা। অথচ এটি আপনার পরবর্তী কবি জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বই। তাহলে কি সময়ের আগেই এই কবিতা আপনি পেয়েছিলেন?**

❑ হয়তো তাই! হয়তো তাই। এটা টাইমের ব্যাপার। লেখার জগতে যে থাকে, তার তো এরকম হতেই পারে যে, পাঁচ বছর আগে একটা বাক্যবন্ধ বেঁধেছিলাম, সেটা আজকে আমি যে বই বের করছি তার নাম হিসেবে দিতে পারি। কবির ব্যক্তিগত প্রবণতা সেটা। এবং যে কবি খুব বেশি মেমরি নিয়ে ঘাঁটে, তার পক্ষে তো এটা ঘটা খুবই সম্ভব। খুবই স্বাভাবিক। এই তুমি বললে না কথাপ্রসঙ্গে, ধুলোগোড়ের কথা, দেউলপুর — এসব আমি শুনেছি। যেন ছেলেবেলায় শুনেছি। বা কলেজে পড়ার সময় শুনেছি। হয়তো ওখান থেকে কোনও ছেলে আসত, তার মুখে শুনেছি। এভাবে কোনওটাই আমার কাছে খুব বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে না। তোমার পক্ষে দেউলপুরে পড়ানো বা জরির কাজ... এসব আমার কাছে নতুন নয়। এতো কালেকটিভ আনকনশাসনেস বলে আমার ধারণা।

সলমা জরির কাজ-এর উৎসর্গপত্রের পাণ্ডুলিপি

হয়তো কোনও জিনিস ভাবছি আমার জানা নয়, কিন্তু জানা! চাপা পড়ে আছে!

❑ চাপা পড়ে আছে! কিন্তু বিদ্যুতের তারের সঙ্গে সংযোগ করলেই আলো জ্বলে উঠবে। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল ওই কালেকটিভ আনকনশাসনেস। যা আমি বই-এ পড়ছি না, বই-এর সঙ্গেও কোনও রিলেশন নেই। আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, হাঁটতে-হাঁটতে কোনও জায়গা দেখে মনে হল এখানে আগেও তো আমি এসেছি! যেমন হায়দ্রাবাদে একটা জায়গাতে চারমিনার আছে। ওখানে আমাকে নিয়ে গেল, ওইদিকে যাওয়ার আগেই আমি তাঁদের বললাম, এই জায়গায় আমি আগে এসেছি। অথচ আমার যা বায়োডেটা, তাতে এর কোনও উল্লেখ নেই!

তাহলে কি আপনি জাতিস্মরের ধারণাকে বিশ্বাস করেন?

❑ জাতিস্মর ব্যাপার ভীষণ বড়ো। তবে জাতিস্মর নিয়ে জয় (গোস্বামী) একটা কথা আমার সম্পর্কে লিখেছিলেন : 'উনি জাতিস্মর ঠিকই, কিন্তু উনি দিশাহীন'। কালেকটিভ আনকনশাসনেস একজন মানুষকে দিশেহারা করে দেয়।

মানে, যেকোনও দিকে পৌঁছে দেয়...

❑ যেকোনও দিকে পৌঁছে দেয়, যেকোনও স্তরে পৌঁছে দেয়। জাতিস্মর শুধু বললেই খালাস, তা তো নয়। জাতিস্মরের অনেক কনট্রিবিউশান থাকে। আমরা জাতিস্মর বলতে বুঝি, ঠিকঠাক পথ বলে দেবে বা অভিজ্ঞতার কথা বলবে, তা না-ও হতে পারে। একটা হাইটে পৌঁছলে সকলেই এই সমস্যাটায় পড়েন। ঠিক আছে, আমি জাতিস্মর, বেশ! কিন্তু তারপর আমি কী করব? আমি দিশেহারা। এর নৈতিক বিচার আছে, বহু কিছু বিচার আছে, বিস্ময়বোধ — সব মিলিয়ে একজন ক্রিয়েটিভ মানুষের সৃজনের কাছে কী ভূমিকা আছে, সেইটেই প্রধান। একের পর এক সমস্যা আসতে থাকে।

তখন সেই সমস্যাটাকে আপনি ভাষায় রূপ দেবেন —

❑ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে এ নিয়ে বেশি জিজ্ঞাসা না করাই ভালো। মানুষ সুখে-স্বাচ্ছন্দে আছে, থাক!

এর সঙ্গে জন্মান্তরের যে প্রথাবদ্ধ ধারণা তার কোনও সম্পর্ক আছে?

❑ হুম! এর সঙ্গে জন্মের কথাও উঠবে, মৃত্যুর কথাও... আমার ধারণা স্মৃতি বলতে যা বোঝায়, তা দুঃখ, কষ্ট, জন্ম, মৃত্যু — এসব মিলিয়েই। তার একটা আলাদা ভূমিকা বা ক্ষেত্র বলা যেতে পারে, তা রয়েছে। বা নৈতিকতা। যেমন কোনও স্মৃতি নিয়ে, এই লাইনটা লিখব, না লিখব না! একটা নীতিবোধ কাজ করে। তখনকার নৈতিকতার ওপর আজকের নৈতিকতা চাপাব কি না... সব মিলিয়ে এ যেন একটা ঘটমান বর্তমান।

কবিতায় সিনট্যাক্স ভাঙার কথা আপনি প্রায়শই বলে এসেছেন। বাংলা কবিতার গঠনের কথা যদি বলি, একটা ট্রেন্ড লক্ষ করা যায়, পাঠক এবং কবির মধ্যে, তা হল একটা কবিতার নির্দিষ্ট শুরু এবং শেষ থাকতে হবে। যেন এ এক অলিখিত দাবি। কিন্তু আপনার কবিতায় সেই প্রথা অনেক জায়গায় ভেঙে যায়। যেমন *নাইট স্কুল*-এর বিভাব কবিতা। আপনার কবিতা অনেক ওপেন। তার কোনও নির্দিষ্ট শুরু ও শেষ নেই। ছাত্রছাত্রীরা গোল হয়ে বসছে, পরিদর্শক আসছে। সে ক্লাস চলাকালীনও চা খেতে পাবে, এরকম একটা কথাতেই শেষ কবিতা। কিন্তু এই শুরু ও শেষের জন্যে যেন প্রস্তুত নয় পাঠকমন।

❑ কবিতার গঠন দেখলে আপাতভাবে বোঝা যাবে তার একটা শুরু-শেষ আছে। কিন্তু পড়লে দেখা যাবে শুরুর আগেও কিছুটা আছে, শেষ হবার পরেও কিছু আছে। আমি এখানে শুধু একটা ফ্র্যাকশন-কে উপস্থিত করেছি। আংশিকভাবে উপস্থিত করছি। সুতরাং বাকিটা পাঠক-পাঠিকা নিজের মতো করে বুঝে নেবেন। অতীতে কী ছিল কবিতার আর ভবিষ্যতে কী আছে। যেজন্য আমার কবিতা পাঠককে খুব চ্যালেঞ্জ করে। সেখানে পাঠককে আমি বলছি, শুরু তুমিই করো, শেষও তুমিই করো। আমি শুধু কয়েকটা সংকেত দেব। পাঠক আর কবি মিলিয়েই কবিতা। পাঠকের সঙ্গে আমার একটা দ্বান্দ্বিক খেলা চলে অবিরাম। এই প্রক্রিয়াই আমার কবিতা।

এই যে আপনি বলছেন ফ্র্যাকশন তুলে দিচ্ছেন, যেন আমাদের জীবনের মতো, সেই জীবনও আসলে ফ্র্যাকশন। যার আগেও রয়েছে, পরেও রয়েছে।

❑ তা নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! আমরা খুব গুরুত্ব দিই, জন্মালাম পৃথিবীতে, মৃত্যু হবে। বিরাট ক্ষতি হবে। কিছু হয় না। পৃথিবী যেভাবে ঘুরছিল সেভাবেই ঘোরে। সময় বহমান।

***বঙ্কীগঞ্জে পদ্মাপারে*-র ভূমিকায় আপনি লিখছেন — 'কেন এর বেশি আমি সবটা বুঝিনি?' এখানে আপনি পাঠক না কবি?**

❑ মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে কবিতাটায়। সবই তো করলাম। খামতি দিইনি

কোথাও। পড়াশুনো করলাম। যুদ্ধ করলাম। রণক্ষেত্রে মারাও গেলাম। সবই ঠিক। কিন্তু বুঝলাম না কিছুই!

ওই জন্য 'মাথামুণ্ড না বুঝেই কাঁদি'!

❑ হ্যাঁ ওইজন্যই 'মাথামুণ্ড না বুঝেই কাঁদি'। এটা জয়ের (গোস্বামী) ব্যাখ্যা আছে, খুব সুন্দর।

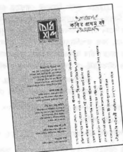
***কহবতীর নাচ*-এর নাম ভূমিকায় বশ্যতা, নাচ, গান, মামুলি জীবনের প্রসঙ্গ এনেছেন আপনি। ভাবগম্ভীর লেখার ওপর এদের উড়ে আসতে বলেছেন। কবিতার যে ধ্রুপদী আঙ্গিক আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে, এটা কি তার বিরোধ?**

❑ আসলে ব্যাপারটা কী, আমি বিজ্ঞান পড়েছি। আমি যা লিখছি, লিখছি। যদি তার মধ্যে কোনও দোষ থাকে, ত্রুটি থাকে, সেটা পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই খুঁজে বার করবেন, এবং সহজেই নজরে পড়বে সেগুলো। আমি কোনওরকম সাহিত্যের ধার ধারি না বলতে যা বোঝায়, তাই। এই যে খোলামেলা জীবন, এটাকে আইন-কানুন করে কে বাঁধবে? কে একে নিয়ন্ত্রণ করবে? আর তাই যদি হত, তবে পৃথিবীতে এত যুদ্ধ, ভালোবাসা, দেশপ্রেম, যা কিছুই বলো, কিছুই তো থাকত না। যখন আমরা নাচ দেখি বা গান শুনি, তখন কি আইন-কানুন বেঁধে শুনি? তখন বড়োজোর জানতে পারি, এটা ভৈরবী। তখন কোথায় ভুল-ভ্রান্তি...

নীতিশাস্ত্র মেপে শোনা...

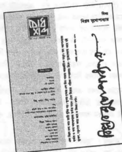
❑ নীতিশাস্ত্র মেপে শোনা হলে তো দেবব্রত বিশ্বাসের গান শুনতেই পারতাম না। কাজেই সৃজনশীল কাজের মধ্যে অনেক নিয়ম-কানুন আছে, যারা মানবেন, মানবেন। তবে না মানলেও কিচ্ছু যায় আসে না। আমার লেখায় বহু ফাঁকফোকর আছে, যেগুলো পাঠকই ভর্তি করে নেন। এবং তাতে আমার বিন্দুমাত্র কোনও আপত্তি নেই। যদি পাঠক নিজের মতো করে মানে করে নেন, ব্যাখ্যা করে নেন, বুঝে নেন, কোনও আপত্তি নেই আমার। আমার লেখায় পাঠক, অর্থাৎ যে গ্রহণ করছে, তার বিরাট ভূমিকা থাকে। এমন নয়, আমি রান্না করে থালা-গ্লাস বেড়ে পাঠককে বললাম — খেতে এসো। পাঠককেও রান্না করতে হবে আমার সঙ্গে!





কবির প্রথম বই

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১১



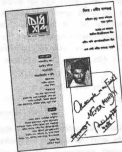
কবি বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০০৯



সৌজন্য সংখ্যা

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১০



কবি প্রবীর দাশগুপ্ত

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০০৮

প্রসঙ্গ বিভাব কবিতা

মার্কা, মিশন ও আত্মপরিচয় : আরেক বিভাব কবিতা

বরুণ চট্টোপাধ্যায়

কোনও কথার মধ্যে যদি সত্যতা থাকে তবে সে কথা সাধারণত অতিপরিচিত ও সহজবোধ্য বলেই বোধ হয়, দৃশ্যত নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে। তাই যখন পড়ি, 'একজন বাল্মীকীকেন্দ্রিক এই শুধুমাত্র প্রেমার্তি... বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রচনা করার ফলে কাব্যের অন্তর্গত সংখ্যাত প্রতিটি অংশ যে কোনো পাঠক কিম্বা পাঠিকার নিজেরই জীবনের কোনো পরিস্থিতির বিশ্লিষ্ট রূপায়ণ ব'লে মনে হবার কথা'। প্রায় একই কথা তো বলেছেন অলংকারশাস্ত্রীরাও :

পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥

'না লিখে পারি না' জাতীয় জবাবে ঠিক বোঝা যায় না কেন কবিতা লেখেন কবিরা। একটা মোটা কারণ আছে এ প্রশ্নের কোনও সুসমীচীন জবাব না পাওয়ার। কবিতা বস্তুটি, যদি তাকে আপাতত বস্তু বলি, যে কী, তা আজও নির্ধারণ করে উঠতে পারেননি কোনও তাত্ত্বিক। তবে কবিতা তো রচিত হয়েই চলেছে, সার্থক উত্তীর্ণ শত-শত কবিতার ধ্বনি কোনও মায়া বা বিভ্রম নয়। ব্যাপারটা অনেকটা প্রাণের মতো, দেহে যে সেটা আছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা আছে কোথায়? রাক্ষসীর ক্ষেত্রে না হয় স্ফটিকের সরোবরের তলায় কৌটোয় রাখা প্রাণভ্রমরার মধ্যে, কিন্তু উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কী? কখন সমবায়ের মধ্যে জেগে থাকে কী এমন নিভৃত নীলপদ্মমধু এই প্রাণ যার লাগি বিজ্ঞান-ভ্রমর আজ বিবাগী! উত্তর মেলে না। তেমনি কবিতার আত্মাও, সন্ধান চলছে নিরন্তর — কিন্তু এক নিরুত্তরতা থেকে আর-এক নিরুত্তর মৌনের দিকে। তবু কবিতা রচিত হচ্ছে।

প্রাচীন আলংকারিকেরা মোটের ওপর একটা কনসেনসাসে পৌঁছেছিলেন। কাব্যনির্মাণকৌশলের তিনটি সঞ্চারসূত্র চিহ্নিত করেছিলেন তাঁরা — বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী। এই অবধিই একজন অসংস্কৃত মানুষ লিখতে পারে, তারপর একমাত্র প্রাজ্ঞের অধিকার।

'বিভাব' শব্দটার স্থূল অর্থ 'কারণ'। 'কারণ' শব্দটি খুব অনায়াসে কানে শুনে বুঝে নেওয়ার মতো অতি সহজ নয়, পাঠক যদি 'কারণ-সলিল' কথাটি স্মরণ করেন তাহলেই এর গূঢ়ার্থপ্রতীতি যে কতটা বহুস্তরসমন্বিত জটিলতার পূর্ণগর্ভ তা মালুম হবে।

একেই 'কবিতা' তায় 'বিভাব'। 'বিভাব কবিতা' মানে যদি কবিতার কারণ হত তাহলে একটু জমি পাওয়া যেত — কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আর কেউ না জানুক, জানেন অলোকরঞ্জন; যিনি এই 'বিভাব কবিতা' আমদানী করেছেন, ঠিক আমদানী নয়, এমনকী আবিষ্কারও নয়, প্রায় উদ্ভাবন করে স্থাপন করেছেন বাংলা কবিতায়। তিনি নিশ্চয়ই কিছু একটা অর্থ, হয় অভিধায় নয় লক্ষণায়, অথবা অন্যতর কোনও তুরীয় সুমেধায় বুঝতে পেরেছিলেন বিভাব কবিতার রহস্য :

সৃষ্টির আড়ালে এক পদ্ম আছে, সৃষ্টির আড়ালে
এক পদ্ম আছে,

মরমীকমল / যৌবনবাউল

কবিতার সঙ্গে যে একটা নিজস্ব অভিজ্ঞানলাঞ্ছিত স্বতন্ত্র সম্পর্ক গড়ে নিতে চেয়েছেন অলোকরঞ্জন, তার আঁচ পাওয়া গেল তাঁর প্রথম বিভাব কবিতাতেই। *যৌবনবাউল*-এর বিভাব কবিতাকেই অলোকরঞ্জনের তথা বাংলা সাহিত্যের (সহৃদয় বিতর্ক বিরোধিতার প্রার্থনা জানিয়ে) প্রথম 'বিভাব কবিতা' বলে সাব্যস্ত করা হল এখানে।

ভগবানের গুপ্তচর মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর
ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না।

যদি এই প্রথম বিভাব কবিতাটিকে ধরে নিই অলোকরঞ্জনের মিতঋজু ম্যানিফেস্টো — তাহলে এটা ঘোর স্পষ্ট ভগবানের সঙ্গে এবং ভগবানের গুপ্তচর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর, অর্থাৎ যে অলোকরঞ্জন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবি, তার একটা আমৃত্যু(হীন) বোঝাপড়া চলতে থাকবেই। এই বার্তাই যৌবন বাউল পাঠালেন কাব্যনভোনীলিমায়, আকাশের ওপারে আকাশে, ছায়াপথে, দূর অজ্ঞাত কাব্যনক্ষত্রপুঞ্জেও। অন্য বহু কবিতার সাক্ষ্য থেকে জানি এক কবিতার সঙ্গে আর-এক কবিতার, যেকোনও 'এক'-এর সঙ্গে আর-এক 'এক'-এর একটা যোগাযোগ থাকে গণিতের মতো। সকলেই এই ভুবনে অন্যকে বলে এই স্বাগতবচন :

'আমরা দুজন চেনা, ঠিকানা জানি না ঠিকই — এতো যোগাযোগ।' কবি মৃদুল দাশগুপ্তের *এভাবে কাঁদে না* কাব্যগ্রন্থে ২০৭০ শিরোনামাঙ্কিত কবিতায় আছে এই যোগাযোগবৃত্তান্তের ইশারা। শিরোনাম সংখ্যায় — তেমন পরিশীলিত কবিতা-পাঠক নই বলেই হয়তো দেবদূতোপম পাঠকদের অতিরিক্ত এক মূর্খ-সুলভ অনবিদ্ধ সাহসে ভর করে বলতে পারি কবিতাটির মধ্যে একধরনের ভবিষ্যমুখিনতা আছে — futuristic বললে নিজেরই বোঝাতে একটু সুবিধে হয় বলে বিভাষার আশ্রয় নিলাম। স্মর্তব্য অগ্রজ অলোকরঞ্জনের অনুবর্তনেই হয়তো মৃদুল দাশগুপ্তও ব্যবহার করেন 'বিভাব কবিতা' নামক আয়ুধ বা মুদ্রা। অলোকরঞ্জনের মতো করে আদৌ নয়, কিন্তু অপার্থিবের সঙ্গে মৃদুলের বোঝাপড়া না থাক, বিনিময়, অন্তত সংযোগ আছে। তাঁর কবিও, ধরে নিতে পারি আবার ওই মূর্খপর্ধার দায়িত্বহীন ক্ষমতার মৌতাতেই, যে মৃদুল মৃদুল দাশগুপ্ত-র কবি, তিনি —

তাপসীকে তার কবি দিলেন অস্ত্র, আর
হাত ধরে নিয়ে চললেন অসীম সৌরবন্দনায়...

কবিতাটিতে এরপর যে মহাজাগতিক আলাপ-জোড়-বিস্তার তা পাঠক পড়ে জানবেন, শেষ পর্যন্ত...

তাপসী ওষ্ঠ ছোঁয়ালো তার কবির ঠোঁটে, মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ চুম্বনের জন্য।

এই যোগাযোগে কিন্তু ঠিকানা জানা আছে 'তাপসী' ও তার কবির। এবং সেই যোগাযোগের আবহে

হাওয়ায় বাজছে সুস্বাগতম, চতুর্দিক আলো করছেন
নক্ষত্রেরা, মন্ত্র ঋষিরা এবং স্বয়ং সূর্যদেব;

এমন আবহ থেকে ডাক আসে অনেকেরই, আসে অজানা চিঠিও, আসতে চায় অন্তত এমন অনুমানেও প্রশান্তি, চিঠি কেউ পাঠাতে চান এমন অগম অনন্তপারে, এমন প্রত্যয়েও আশ্বাস।

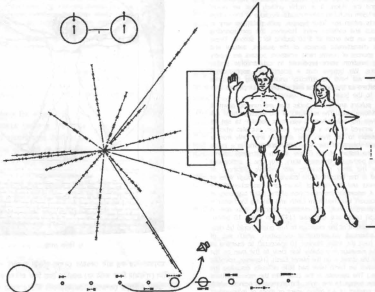
ভিয়েতনাম যুদ্ধ প্রায় শেষের পথে। আমেরিকার শ্বেতসৌধে নিজস্ব গোঁয়ার গেঁড়েমো নিয়ে আড়ি পাতার ফাঁদ পেতেছেন ডিক নিক্সন। এমন অসময়ে, ১৯৭১ — নাসা-র বিজ্ঞানীকুলের এমন কোনও প্রকাশক ওই অপার্থিবের ডাক পেলেন যিনি দৃশ্যত মার্কিন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে খদ্দর বা আদ্দি পরিহিত বাঙালি বন্ধুবাবু। বন্ধুর ডাক। শুরু হল আয়োজন। অজ্ঞাত অজ্ঞেয় নক্ষত্রের অজ্ঞেয়তর বন্ধুর খোঁজে হাসিল করা হল এক বনের মোষ তাড়ানোর মতো পবিত্র প্রকল্প (অন্তত এখনও পর্যন্ত তাই জানে আমজনতা, আর যা বলে বলুক উইকিলিকস) — পায়োনিয়র দশ এবং পায়োনিয়র একাদশ নামে মানিকজোড় মহাকাশযান দু-টিকে মহাশূন্যের পরপারে পাঠানো হবে অপার্থিব বুদ্ধিসম্পন্ন, না-মানব বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীর সন্ধানে এক প্রায় সাফল্য-সম্ভাবনাহীন মিশনে। বিচিত্রগামী খলিফা বিজ্ঞানীপ্রবর কার্ল সাগানের মনে হল মহাকাশযানটির আভ্যন্তর-স্থাপত্য যতই তুখোড় হোক — এর গায়ে একটা চোখে-পড়ার মতো গয়না অর্থাৎ

অলংকার পরিয়ে দেওয়াটা খুব জরুরি। 'পহেলে দর্শনধারী' প্রবাদটা নাই জানুন, তার মতলবটা সাগান বিলক্ষণ বুঝতেন। গমনাগমনে যদি কোনও ভিনগ্রহীর চোখে পড়ে যায়, তাহলেই তো কেল্লা ফতে! কিন্তু এমন যে মহাকাশযান তার গায়ে তো আর গুপি স্যাকরার পান মেশানো খাজা সোনার ফংফঙে নোলক পরালে চলবে না, এখানে দরকার এমন স্বর্ণশিল্পীর সুষমিত এক্সক্লুসিভ যা চোখে পড়লেই মালুম হবে এমন জবরদস্ত জেওয়র নিশ্চয়ই কোনও শাহি খানদানের — সঙ্গে যেন কুলকৌলীন্য অর্থাৎ জাতটাও এক ঝলকে বোঝা যায়। তাহলে তো এই অলংকারের একটা নকশা পেশ করা দরকার কর্তৃপক্ষের কাছে! কাজটা করবে কে? এমন বিজ্ঞাপন (আপাতত এই অভিধা ব্যবহার করছি) তো শুধু অ্যাডনবিশ বানাতে পারবে না,। তাকে দস্তুরমতো বিজ্ঞান জানতে হবে। ক্লায়েন্ট কে, না স্বয়ং নাসা! তার প্রতিনিধি মহাকাশযান, যার ঘোষিত উদ্দেশ্যই হল অচিন ভিনগ্রহীকে বুঝিয়ে দেওয়া এই গ্রহে মানুষের মতো বুদ্ধিমান জীব আছে, মহাকাশে এই গ্রহের স্থানাঙ্ক — এবং অবশ্যই এই তথ্যের সাড়ম্বর প্রচার যে তারা বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে আকাশ ছুঁয়েছে, আক্ষরিক অর্থেই। মতলবটা যেহেতু সাগানের, আর সাঁকোটা তিনিই নাড়িয়েছেন, নকশার দায়িত্বটা পড়ল তাঁর ঘাড়েই। ধুরন্ধর সাগান অকুতোভয়। বছর দুয়েকের বিবাহিত জীবনে তিনি বুঝে গিয়েছেন তাঁর ঘরনী লিন্ডা সেলজম্যান নিজেই তুখোড় শিল্পী, মাথাটাও বেশ সাফ! তাহলে আর বাইরের লোককে ডাকা কেন? ঘরের কড়ি ঘরেই থাক!

'বিদেশী ভাষায় কথা বলার মতন সাবধানে'-এই নকশা তৈরির কাজ শুরু করলেন লিন্ডা। ছবি আঁকায় তিনি যথেষ্ট দড়, বিশেষ করে মানবশরীর, কিন্তু প্রসঙ্গটা এমন যে অতীতের কীর্তি বা অভিজ্ঞতা বাধা দিলে মুশকিল। কিন্তু বোস্টনের স্কুল অফ দ্য মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টস-এর এই প্রাণোচ্ছল তরুণী লিন্ডা চমকে দিলেন সকলকে। স্বয়ং সাগানের জবানিতে যা ঘটেছিল তার খানিকটা উদ্ধৃত করা যাক :

When my attention was drawn to the possibility of placing a message in a spac-age bottle, I contacted the Pioneer 10 project office and NASA headquarters to see if there were any likelihood of implementing this suggestion. To my surprise and delight, the idea met with apporoval at all steps up the NASA hierarchy, despite the fact that it was, by ordinary standards – very late to make even tiny changes in the spacecraft. During a meeting of the American Astronomical Society in San Juan, Puerte Rico, in December 1971, I discussed privately various possible messages with my colleague professor Frank Drake, also of Cornell. In a few hours we decided tentatively on the contents of the message. The human figures were added by my artist wife, Linda Selzman Sagan. We do not think it is the optimum conceivable message for such a purpose. There were a total of only three weeks for the presentation of the idea, the design of the message, its approval by NASA, and the engraving of the final plaque. An identical plaque has been launched in 1973 on the Pioneer 11 spacecraft, on a similar mission.

It is etched on a 6-inch by 9-inch gold-anodized aluminum plate, attached to the antenna support struts of Pioneer 10. The expected erosion rate in interstellar space is sufficiently small that this message should remain intact for



পায়োনিয়র ফলক

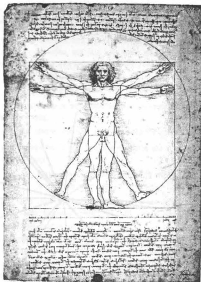
hundreds of millions of years, and probably for a much longer period of time. It is, thus, the artifact of mankind with the longest expected lifetime.

The message itself intends to communicate the locale, epoch, and something of the nature of the builders of the spacecraft. It is written in the only language we share with the recipients: Science. At top left is a schematic representation of the hyperfine transition between parallel and antiparallel proton and electron spins of the neutral hydrogen atom. Beneath this representation is the binary number 1. Such transitions of hydrogen are accompanied by the emission of a radiofrequency photon of wavelength about 21 centimeters and frequency of about 1,420 Megahertz. Thus, there is a characteristic distance and a characteristic time associated with the transition. Since hydrogen is the most abundant atom in the Galaxy, and physics is the same throughout the Galaxy, we think there will be no difficulty for an advanced civilization to understand this part of the message. But as a check, on the right margin is the binary number 8(1---) between two tote marks, indicating the height of the Pioneer 10 spacecraft, schematically represented behind the man and the woman. A civilization that acquires the plaque will, of course, also acquire the spacecraft, and will be able to determine that the distance indicated is indeed close to 8 times 21 centimeters, thus confirming that the symbol at top left represents the hydrogen hyperfine transition. Further binary numbers are shown in the radial pattern comprising the main part of the diagram at left center. These numbers, if written in decimal notation, would be ten digits long. They must represent either distances or times. If distances, they are of the order of several times 1011 centimeters, or a few dozen times the distance between the Earth and the Moon. It is highly unlikely that we would consider them useful to communicate. Because of the motion of objects within the Solar System, such distances vary in continuous and complex ways. However, the corresponding times are on the order of 1/10 second to 1 second. These are the characteristic periods of the pulsars, natural and regular sources of cosmic radio emission; pulsars are rapidly rotating neutron stars produced in catastrophic stellar explosions. We believe that a scientifically sophisticated civilization will have no difficulty understanding the radial burst pattern as the positions and periods of 14 pulsars with respect to the Solar System of launch.

But pulsars are cosmic clocks that are running down at largely known rates. The recipients of the message must ask themselves not only where it was ever possible to see 14 pulsars arrayed in such a relative position, but also when it was possible to see them. The answers are: Only from a very small volume of the Milky Way Galaxy and in a single year in the history of the Galaxy. Within that small volume there are perhaps a thousand stars; only one is anticipated to have the array of planets with relative distances as indicated at the bottom of the diagram. The rough sizes of the planets and the rings of Saturn are also schematically shown. A schematic representation of the initial trajectory of the spacecraft launched from Earth and passing by Jupiter is also displayed. Thus, the message specifies one star in about 250 billion and one year (1970) in about 10 billion.

The content of the message to this point should be clear to an advanced extraterrestrial civilization, which will, of course, have the entire Pioneer 10 spacecraft to examine as well. The message is probably less clear to the man on the street, if the street is on the planet Earth. (However, scientific communities on Earth have had little difficulty decoding the message.) The opposite is the case with the representations of human beings to the right. Extraterrestrial beings, which are the product of 4.5 billion years or more of independent biological evolution, may not at all resemble humans, nor may the perspective and linedrawing conventions be the same there as here. The human beings are the most mysterious part of the message.

সাগানের এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি ভাষান্তর না-করাটা সচেতন সিদ্ধান্ত, আলস্য বা অক্ষমতা নয়। প্রায় ফেইনম্যান-সুলভ যে মিচকে এক মুচমুচে ভাষায় লেখেন সাগান, তার অনুবাদ আপাতত নাই বা হল! আসল কথা কী চাইছেন সাগান? ঘরনী যখন ঘর্মাক্ত হয়ে স্কেচ করছেন আর পায়চারি করছেন সাগান, তখনকার নিভৃত নাটকটা ভাবতে ইচ্ছে করে। সাগান-গিন্নি শিল্পী, সাগান বিজ্ঞানী — কিন্তু দু-জনেই চরম চটুল ও আমুদে। ওই নগ্ন নরনারীর ছবি নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে পুরুষটির হাতের ভঙ্গিমায় কেউ খুঁজে পেয়েছেন ফ্যুয়েরারের ভঙ্গিমার অনুষঙ্গ, বস্তুত ওটাকে বরাভয় ভাবাই ভালো যদিও। নাসা-র এক প্রকাশিত নথিতে নারীটির স্তনবৃত্ত ও যোনির চেরা দাগ মুছে দেওয়া হয়েছিল। হই-হই করে উঠেছিলেন ফেমিনিস্টরা — নারীটিকে পুরুষের থেকে উচ্চতায় ছোটো করে আসলে নাকি নারীত্বকে খাটো করা হয়েছে। কী মুশকিল! ইনি কি একজন গোর্খা পুরুষ আর সঙ্গের নারীটি জার্মান বা ইথিওনীয় যে পুরুষটি নারীর চেয়ে বেঁটে হবে! একই নৃ-গোষ্ঠীর নারী-পুরুষের শারীরিক দৈর্ঘ্যের অনুপাত অ্যানাটমিকুশলী-শিল্পী লিন্ডা সেলজম্যান সাগান ঠিকই ধরেছেন, তিনি ভিনগ্রহের ফেমিনিস্টের কথা ভাবেননি ভাগ্যিস! কিন্তু এই অধমের একটা অনুমান আছে — ওই সময় সাগান ও লিন্ডার দুটো পূর্ণাবয়ব ছবি আর দুটো X-ray Plate পাওয়া গেলে হয়তো এক একান্ত মুহূর্তের মাধুর্য পাওয়া যাবে।



দ্য ভিঞ্চি কোড

মানবমানবীর নগ্ন ছবি দেওয়ার নেপথ্য-যুক্তিটা অবশ্যই পৃথিবীটার একমাত্র প্রশ্নশীল (বুদ্ধিমান কিনা জানি না) প্রজাতির দ্বৈত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করাটা জরুরি ছিল। যদি অধুনা আবিষ্কৃত কেপলারে বিজ্ঞানচর্চাকারী জীবের সন্ধান পাওয়া যায়, দেখা যাবে লিঙ্গের হয়তো এমন এক বিকলাঙ্গ অস্তিত্ব আছে যা মানবকল্পনায় আজও অধরা। উক্ত মানব মিথুনের সঙ্গে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'The vitruvian Man' নামক যুগান্তকারী নকশার অনুষঙ্গে সরল বক্রতল, π-এর ধারণা ও আরও জটিল

গাণিতিক অনুভব গ্রথিত করেছেন লিন্ডা। যদি বিদ্বজ্জন মাত্রই জানেন, তবু একবার স্মরণ করিয়ে দিই আদর্শ রোমান স্থপতি ভিট্রুভিয়াসের বৃত্ত ও বর্গের অনুপাত তত্ত্ব অবলম্বনে ভিঞ্চি এই নকশাটি আঁকেন।

অ্যাং, ইটি, গোলাপীবাবু ইত্যাদি ভিনগ্রহীদের সঙ্গে এবং সাধারণভাবে ভিনগ্রহীদের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বৃত্তান্তে যাঁরা আগ্রহী এবং কল্পবিজ্ঞান-রসিক তাদের অনুরোধ করব উইলিয়াম আর রেয়ার-এর *The Reach Beyond Tommorrow* উপন্যাসটি একবার পড়ে নিতে। ঈষৎ প্রসঙ্গচ্যুতির পর আবার বক্তব্যের মূলস্রোতে ফিরে আসা যাক। সাগান নভোযানটিতে যে ফলকটি লাগালেন সেটির সঙ্গে বিভাব কবিতার কী সম্পর্ক? যৌক্তিক কিছু নাকি হাঁসজারু দেয়ালা বিস্তার করে চলেছি? কী ভাবছেন পাঠক? ঠিক আছে, এবার একটি কবিতায় ফেরা যাক।

বাঙালি আমলাদের মধ্যে একটা প্রবল কবিত্বপ্রবণতা দেখে যে সব নিন্দুক সন্দেহ প্রকাশ করেন তাঁদের জানাই নাসা-র মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও কোনও একভাবে যুক্ত ছিলেন উত্তর আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্ট শহরের এক সাহিত্যশিক্ষক। অর্ভিড এফ স্পনবার্গ নামে এক সুবিখ্যাত নাট্যতাত্ত্বিক ওই সময়ে শিক্ষকতা শুরু করেছেন আমেরিকার ইন্ডিয়ানা প্রদেশের গর্ব Valparaiso বিশ্ববিদ্যালয় বা সংক্ষেপে valpo-তে, যার নাম শুনলেই উচ্চশিক্ষিত মানুষ নড়েচড়ে বসবেন। পায়োনিয়র দশ-এর ভিনগ্রহী সন্ধানের একাগ্র উদ্যোগ এবং বিশেষভাবে সেক্ষেত্রে সাগানের ভূমিকায় অনুপ্রাণিত হয়ে অধ্যাপক স্পনবার্গ লিখে ফেললেন *New Odyssey* বা *নব মহাপরিক্রমা* শিরোনামের একটি চতুর্দশপদী :

Away, afar, beyond, bereft of kin,
Wayward, wandering, far ranging vagabonds,
Yearning, stardrawn, the Pioneers sweep on,
Outward bound, adrift on the solar wind.
A man, a woman, orphans of warm earth
Or splendid voyageurs with golden sails,
Or gypsies roaming ancient stellar trails,
A caravan in quest of celestial berth.
If, deep within cold interstellar space,
Some fearful eyes spies life on this raft,
Will it perceive the heart within our craft,
A pulsar pounding out the rhythms of peace?
A spirit's starburst pierces new frontiers;
An Odyssey is our home; let us praise Pioneers!

গৃহে নিরাপদে প্রিয় পরিজন মিতা
জ্যোতিষ্কলোকে বেগানা এ ঘোড়সওয়ার
ওগো দূর পরবাসী কাব্যে উপেক্ষিতা?
কান পাতো তুমি ডাকে যে পায়োনিয়র।
এ সোনার তরী ভরে শুধুই বারতা
করেছি বোঝাই শুধু এক আলেখ্যতে
মানব মানবী নগ্ন কিছু সংকেতে
মুঠি ভরা দু-জনের বিশ্বস্ত কথা
অবনী কি বাড়ি আছো অন্য অবনীতে
মহাশৈত্যে করতলে গুপ্ত কবোষ্ণতা
একবার মুখ তোলো চাও চারিভিতে
কথা কও কথা কও নিছক ভব্যতা
নেই মৃদু আহ্বানে এ নব ওডিসি
বয়ে আনে বন্ধুতার বিভাব কবিতা

কাব্য ফাঁদার ন্যূনতম বাসনা না থাকলেও অধ্যাপক স্পনবার্গের চতুর্দশপদীটি অনুবাদের হয়তো চেষ্টা করলাম বৃথাই। আর দেরি নয়, এবার সিদ্ধান্তে আসি। পায়োনিয়র দশ-এর বহির্পৃষ্ঠে সাগান পরিকল্পিত এই বিখ্যাত Pioneer Plaque-টিকে আমি বিভাব কবিতা-র দৃষ্টান্তস্থল বলে মানলাম এ রচনায়।

একেকটি কবিতার বই আছে, থেকে গেছে এ পৃথিবীতে, যেখানে একটি বিভাব কবিতার স্বাগতসম্ভাষণের পর যেখানে অন্দরমহলে চলে যায়নি অন্য কবিতাগুলি। সেখানে প্রতিটি কবিতাই একাধারে বাসরঘর ও সিংহদুয়ার, প্রতিটি কবিতাই প্রতিটি কবিতার, প্রতিটি এককের, সমগ্র সংকলনের বিভাব কবিতা, প্রতিটি কবিতার বিভাব কবিতা প্রতিটি কবিতাই।

কবিতা বুঝেছি আমি; অন্ধকারে আমার আশ্রয়
অলৌকিক আলো দেয়, নিরুত্তাপ, কোমল আলোক।
...

যেন
অমল আয়ত্তাধীন অবশেষে করে দিতে পারে
অধরা জ্যোৎস্নাকে; তাকে উদগ্রীব মুষ্ঠিতে ধরে নিয়ে
বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশের, অনন্তের সার পেতে পারি।
এই অজ্ঞানতা এই কবিতায়, রক্তে মিশে আছে
মৃদু লবণের মতো, প্রশান্তির আহ্বানের মতো।

স্বরূপত বিভাব কবিতামাত্রই হতে চায়, হয়ে থাকে, প্রশান্তির আহ্বানের মতো। যে অর্থে চতুর্থ প্রচ্ছদে প্রকাশকের প্ররোচনায় লিখিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থচূর্ণক অর্থাৎ ব্লার্ব শশব্যস্ত, আত্মজ্ঞানহীন, দিশেহারা পাঠক-ক্রেতাকে অন্যসব বই থেকে সরিয়ে নিজের দিকে টেনে আনে বিভাব কবিতার মধ্যে ব্লার্বের কোনও লক্ষণ খোঁজা শুধু যেচে আঘাটায় যাবার নামান্তর। তবে এ প্রসঙ্গে ব্লার্বের জন্মবৃত্তান্তটি বলে রাখা ভালো।

১৯০৭ সনে জিলেট বার্জেস (Gelett Burgess) নামে এক আমোদগেঁড়ে কিন্তু মেধাবী ও ফন্দিবাজ শিল্পী *I never saw a purple cow* নামে একটি চৌপদী লিখে বেশ খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তিনি ঠিক কী কিসিমের মানুষ ছিলেন, তা মালুম হবে আরেকটি চৌপদীর শেষ পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত করলে :

But I can tell you, anyhow,
I'll kill you if you quote it

দ্বিতীয় চৌপদীটি নাকি প্রথম চৌপদী লেখার আত্মগ্লানির প্রেরণায় রচিত বলে বার্জেসের দাবি। কিন্তু বার্জেস যেমন মানুষ তাতে মনে হয় আত্মগ্লানি নয়, আক্ষেপানুরাগ থেকেই দ্বিতীয় চৌপদীটির জন্ম। সাধারণভাবে ইংরেজি অভিধানে অন্তর্ভুক্তি অথবা সাম্প্রতিককালে ইন্টারনেটে অন্তর্ভুক্তির বহু আগেই স্বয়ং বার্জেস 'Blurb' শব্দটির সংজ্ঞা এবং উপযোগিতা নির্ধারণ করেছিলেন — *Burgess unabridged A dictionary of words you have always needed* নামক অভিধান গ্রন্থে — 'Blurb n. 1. A flamboyant advertisement; an inspired testimonial. 2. Fulsome praise, a sound like a publisher. Blurb v. to flatter frominterested motives, to compliment oneself.

On the 'jacket' of the latest fiction, we find blurb; abounding in agile adjectives and adverbs, attesting that 'this book is the sensation of the year.'

বার্জেস ছিলেন একজন শব্দনির্মাতা এবং মজার ছবি আঁকিয়ে। 'Blurb' শব্দটির মধ্যে ঘটেছে এই দুয়ের মিশ্রণ। এ-প্রসঙ্গে বার্জেসের মতটি হল —

> Other dictionaries have recorded the words of yesterday, my lexicon will give the words of tomorrow. What matter if none of them is derived from two 'Greek Words'? My words will be imaginations, penandinkumpoops, whimpusles, mere boojums rather that classic snarts,... I shall create them from instinctive, inarticulate, emotions, hot from the depths of necessity.

এই ভাবনা থেকেই *Are you a Bromide?*, ১৯০৭-এ প্রকাশিত এই বই-এর সঙ্গে ব্লার্ব সংযুক্তি। এই গ্রন্থে প্রচার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবহার করেন এক লাস্যময়ী নারীর ছবি, যে ছবিটি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন একটি দাঁতের বিজ্ঞাপন থেকে এবং সেই নারীর নামকরণ করেন Miss Belinda Blurb এবং ঘোষণা করেন —

YES, this is a "BLURB" এবং ছবিটিতে মুখে হাত রেখে প্রচারের ভঙ্গিতে মেয়েটির ছবি প্রসঙ্গে লেখেন In the Act of blurbing। এভাবে শুরু এবং পরবর্তীকালে সাদরে গৃহীত হচ্ছে শব্দটি, বিশেষত প্রকাশকদের কাছে, অভিধানে ঘটছে শব্দটির অবশ্যম্ভাবী অন্তর্ভুক্তি।

YES, this is a "BLURB"!

All the Other Publishers commit them. Why Shouldn't We?



ARE YOU A BROMIDE?

BY

GELETT BURGESS

Say! Ain't this book a 90-H. P., six-cylinder Seller? If WE do say it as shouldn't. WE consider that this man Burgess has got Henry James locked into the coal-bin, telephoning for " Information "

WE expect to sell 350 copies of this great, grand book. It has gush and go to it, it has that Certain Something which makes you want to crawl through thirty miles of dense tropical jungle and bite somebody in the neck. No hero no heroine, nothing like that for OURS, but when you've *READ* this masterpiece, you'll know what a BOOK is, and you'll sic it onto your mother-in-law, your dentist and the pale youth who dips hot-air into Little Marjorie until 4 Q. M. in the front parlour. This book has 42-carat THRILLS in it. It fairly BURBLES. Ask the man at the counter what HE thinks of it! He's seen Janice Meredith faded to a mauve magenta. He's seen BLURBS before, and he's dead wise. He'll say:

This Book is the Proud Purple Penultimate!!

বেলিন্ডা ব্লার্ব

বার্জেস কিভাবে তার বই-এর জ্যাকেটটিকে Blurb-এ পরিণত করেছেন তা মুদ্রিত চিত্রে দেওয়া রয়েছে। একটি বইকে কিভাবে পাঠক আগ্রহের বিষয় করে তোলা যায় ব্লার্বটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ —

> Say! Ain't this book a 9 H.P., six-cylinder seller? If we do say it as shouldn't. We consider that this man Burgess has got Henry James locked into the Coal-bin, telephoning for 'Information' .
>
> We except to sell 350 copies of this great, grand book. It has gush and go to it, it has that certain something which marks you want to crawl through thirty miles of dense tropical jungle and bite somebody in the neck. No hero, no heroine, nothing like that for OURS. But when you've READ this masterpiece, you'll know that a Book is, and you'll sic it onto your mother-in-law Your dentist and the pale youth who dips hot-air into Little Marjoric until 4 Q.M. in the front parlour. This book has 42 Carat THRILLS in it. It fairly BURBLES. Ask the man at the counter what what HE thinks of it? He's seen Jamice Meredith faded to a mauve magenta. He's seen BLURBS before, and he's dead wise. He'll say.
>
> This Book is the proud purple penulimate!!

বার্জেস নির্মিত ব্লার্ব-এর লক্ষণগুলির প্রতিফলন ঘটেছে উপরের লেখাটিতে। বিষয় নয়, তার আভাস 'a flamboyant advertisement; an inspired testimonial.'। যে বর্ণনা প্রতিষ্ঠা করবে এই তথ্যটি 'this book is the sensation of the year'। এভাবে সূত্রপাত, তবে পরবর্তীকালে ছবিটি আর ব্যবহৃত হয়নি, লেখাটিই ব্লার্ব হিসেবে বিবেচিত।

এমন অনেকে আছেন যাঁরা হাসলে প্রথমে দাঁতগুলিই চোখে পড়ে। *আদিম রিপু* আখ্যানের মিস ননিবালা প্রসঙ্গে শরদিন্দুর অমর উক্তিটি এ প্রসঙ্গে রসিকজনের মনে পড়ার কথা। কিন্তু ব্লার্বের মতো বিজ্ঞানী দন্তবিকাশ বিভাব কবিতায় থাকে না। কী থাকে তার একটা ইশারা বিভাব কবিতার স্রষ্টা অলোকরঞ্জন স্বয়ং দিয়েছেন *বিভাব* নামের একটি কবিতায়, কিন্তু এ কবিতাটি বিভাব কবিতা নয় :

> দরবেশেরা নেচেছিল নক্ষত্রের নীচে
> কল্যানীর মেলায়, তবু খুঁজেছিলাম সত্তার শাশ্বত
> আলম্বন বিভাব, নিছক হৃদয় এবং ইন্দ্রিয় পার হয়ে;
> এবং সেটাই দেখি হঠাৎ : বেড়ার উপর অর্ধেক ভর করে
> দাঁড়িয়ে তুমি নিরপেক্ষ, ব্রহ্ম যেমন একটি অক্ষরে —

বিভাব কবিতার সারমর্ম এই; বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। সহজ কথা, কিন্তু এত সহজ যে বুঝে উঠতে সরল সুবুদ্ধি ছাড়া কোনও গতি নেই। এবার একটি প্রত্নআখ্যান বলে এ বাচালতা থেকে পাঠককে নিস্তার দেওয়া যাক :

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে গৃহদ্বারে নিয়োজিত হয় কে? সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে মনে হতে পারে কাজটা আসলে তকমাধারী পেয়াদার। কিন্তু সে এক যজ্ঞ হয়েছিল দ্বাপর যুগে; যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ। সেই মহা আয়োজনে কাকে কোন দায়িত্ব দিলেন ধর্মপুত্র?

> দুঃশাসনের প্রতি নিখিল ভোজ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধাণের ভারার্পন করিলেন, অশ্বত্থমাকে বিপ্রসেবায় নিযুক্ত করিলেন, সঞ্জয় রাজপরিচর্য্যায় তৎপর হইলেন এবং মহানুভব ভীষণ ও দ্রোণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। রজত, সুবর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ রত্নসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে ও দক্ষিণাপ্রদানে কৃপাচার্য্যকে আদেশ করিলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে অপরাপর কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত এবং জয়দ্রথ ইহাঁরা গৃহপতির ন্যায় বিরাজমান রহিলেন। দুর্য্যোধন উপায়ন-প্রতিগৃহে (নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের উপঢৌকনরূপে প্রেরিত দ্রব্য গ্রহনে) এবং **শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন।**
>
> অধ্যায় ৩৪, সভাপর্ব / কালীপ্রসন্ন সিংহ

মহাভারতের যিনি আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব তিনি কিনা রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালন করছেন? আসলে বিভাব সর্বত্র প্রকট হয় না, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে বলতে পারি, আমরা তো কারণের ফল কার্যই দেখি, কাব্যতত্ত্বের দিক থেকে যার নাম অনুভাব।

> স্ব-স্ব কারণ দ্বারা অন্তরুদ্বুদ্ধ রত্যাদিকে বাহ্যে প্রকাশ করাইয়া, লোকে যাহা কার্যরূপে পরিণত হয়, কাব্যনাটকাদিতে তাহাই অনুভাব বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক কথায় বলিতে হইলে, স্থায়িভাবের কার্য্যকে অনুভাব কহে।
>
> *কাব্য-দর্পণ* / শ্রী জয়গোপাল গোস্বামি প্রণীত

গোস্বামী মহাশয় অতি সংক্ষেপে আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবের ফারাকটুকুও বুঝিয়ে দিয়েছেন :

> আলম্বন ও উদ্দীপনে প্রভেদ এই যে, যিনি অদ্ভুতাদি রসের বিষয়,

তিনিই আলম্বন বিভাব, আর প্রধানত যাহা রসের বিষয় নহে, অথচ রসের পরিপোষক তাহার নাম উদ্দীপন বিভাব।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-র দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের আত্মপরিচিতির মধ্যে বিশ্বের বিভাব রহস্য প্রচ্ছন্ন, অন্তত আভাসিত। বিভাব কবিতা প্রসঙ্গেও তাবৎ সৃষ্টির যিনি 'কারণ' তাঁর আত্মপরিচিতিটি ব্যবহার করা যায়, যদি একটি কবিতার বইকে একটি মহাবিশ্ব বলে মান্য করি তবেই অবশ্য।

> আমার আবির্ভাব দেবগণ এবং মহর্ষিগণও অবগত নহেন; কারণ আমি সর্ব্বতোভাবে দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি (অর্থাৎ তাহাদিগের উৎপত্তি ও বুদ্ধ্যাদি প্রবৃত্তির কারণ)।
>
> অনুবাদ : শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ

বিশ্বের কারণস্বরূপ শ্রীভগবান রাজসূয় যজ্ঞে পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে ব্রাহ্মণগণের অভ্যর্থনা করেছিলেন, অনুরূপ মহীয়ানতায় সংকলনের মহাবিশ্বে পাঠককে আহ্বান করে বিভাব কবিতা। কিমধিকমিতি।

বিভাব কবিতার সংজ্ঞা : সংস্কৃত থেকে বাংলা

অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য

বিভাব কবিতার কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণ সম্ভব কিনা জানি না, তবে বিষয়টি নিয়ে একটি আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। আর তাতে পাঠকদের কিছু লাভ হোক বা না-হোক, লেখকের সমূহ লাভ। কারণ এই সুযোগে অন্তত নিজের মনের ধারণাগুলিকে কিছুটা স্পষ্ট করে নেওয়া যাবে। বস্তুত ১৯৫৯ সনে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর *যৌবনবাউল* কাব্যসংকলনটি প্রকাশিত হলে বাংলা কবিতার পাঠক প্রথম 'বিভাব কবিতা'-র মুখোমুখি হন। সে-কবিতাটিতে তরুণ কবির সংকল্পের যে স্পর্ধিত ঘোষণা রয়েছে তা যেমন সংকলনের কবিতাগুলির মূল সুরটিকে ধরিয়ে দেয়, তেমনি কবি হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও তাঁর কাব্যাদর্শকেও চিহ্নিত করে। এরপর তিনি *নিষিদ্ধ কোজাগরী* (১৯৬৭), *রক্তাক্ত ঝরোখা* (১৯৬৯), *ছৌ কাবুকির মুখোশ* (১৯৭৩) প্রভৃতি কাব্যসংকলনগুলিতেও একই রীতি অবলম্বন করেন। অলোকরঞ্জনের কবিতার, বিশেষ করে গদ্যরচনার সঙ্গে যাঁরা মোটামুটি পরিচিত তাঁরা হয়তো লক্ষ করেছেন যে বহুপাঠী এই কবি সাহিত্য ও দর্শনের নানা পারিভাষিক শব্দকে নিজের রচনায় শুধু প্রয়োগই করেন না, তাদের নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেন। 'বিভাব' শব্দটিও তেমনি একটি পারিভাষিক শব্দ।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বহুল ব্যবহৃত 'বিভাব' শব্দটির তাৎপর্য বুঝতে তাই অভিধানের সাহায্য না নিয়ে অলংকারশাস্ত্রের দ্বারস্থ হতে হবে। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র অতি প্রাচীন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে অলংকারশাস্ত্র বলতে শুধু অনুপ্রাস, উপমাদি অলংকারের ব্যাখ্যা বোঝায় না। অলংকারশাস্ত্র আসলে কাব্যতত্ত্ব (poetics) বা সাহিত্য সমালোচনার (literary criticism) শাস্ত্র। অলংকারশাস্ত্রের প্রাচীনতম যে গ্রন্থ পাওয়া গেছে তা হল ভরত মুনির *নাট্যশাস্ত্র*। কিন্তু ভরত 'বিভাব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন রস প্রসঙ্গে। কাজেই বিভাব নিয়ে আলোচনার আগে রস সম্পর্কে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। ভরত অবশ্য তাঁর গ্রন্থে নাটকের রস নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালের আলংকারিকগণ কাব্য আলোচনার ক্ষেত্রেও সেই রসকে গ্রহণ করেছেন। সংস্কৃতে 'রস' শব্দটি 'রস্' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'রস্' ধাতুর অর্থ স্বাদ গ্রহণ করা। সুতরাং যা আস্বাদ্য তা-ই রস। জিভ দিয়ে আমরা খাদ্যদ্রব্যের টক, নোনতা বা মিষ্টি রস (স্বাদ) গ্রহণ করি। এজন্য জিভকে রসনা বলা হয়। রসনেন্দ্রিয় একটি বহিরিন্দ্রিয় যা দিয়ে আমরা খাদ্যদ্রব্যের স্থূল রস গ্রহণ করি। কিন্তু সাহিত্যের সূক্ষ্ম রস আস্বাদন করবার জন্য চাই অন্তরিন্দ্রিয়। ভারতীয় দর্শনে মনকে ষষ্ঠেন্দ্রিয় বা অন্তরিন্দ্রিয় রূপে গণ্য করা হয়। এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কাব্যের শৃঙ্গার, করুণ, বীর, হাস্য প্রভৃতি রস আস্বাদন করা হয়। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন পাঠকের অনুভূতিশীল মন। ভরত প্রথমে আটটি রসের উল্লেখ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এদের সঙ্গে শান্ত রসও যুক্ত হয় এবং অধিকাংশ আলংকারিক কাব্যে ন-টি রসকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই ন-টি রসের আবার ন-টি স্থায়ী ভাব রয়েছে।

এবারে ভরতের সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে। নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে,

> ন হি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ততে।
> তত্র বিভাবানুভাব ব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ॥

...অর্থাৎ, রস ব্যতীত কোনও বিষয় প্রবর্তিত হয় না। সেখানে (নাটকে) বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়। ভরতের মতে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগের ফলে স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয়। কিন্তু বিভাব কাকে বলা হবে? ভরত নিজেই বলেছেন যে কারণ, নিমিত্ত, হেতু — এগুলি বিভাবের পর্যায় শব্দ অর্থাৎ প্রতিশব্দ (synonym)। তাহলে বিভাব হচ্ছে রসানুভূতির কারণ বা হেতু। বিভাব আবার দু-রকম — আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। নাটকাভিনয় দর্শন বা কাব্যপাঠের সময়ে সহৃদয় দর্শক বা পাঠকের মনে যে অলৌকিক চিত্তবৃত্তির উদয় হয় তার বিষয়ের নাম আলম্বন বিভাব। যেমন নায়িকাকে দেখে নায়কের মনে রতি ভাব জাগল। শৃঙ্গার রসের স্থায়ী ভাব হল রতি। এক্ষেত্রে নায়িকা হল আলম্বন বিভাব। আলম্বন বিভাবের দ্বারা উদ্‌বোধিত রসের পুষ্টি বা পোষণ করে যা তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। নায়িকাকে দেখে নায়কের মনে যে রতি ভাব জাগে তা লৌকিক। কিন্তু সহৃদয় দর্শকের মনে যে শৃঙ্গার রস উদ্রিক্ত হয় তা অলৌকিক। তাকে পরিপুষ্ট করে বসন্ত সমাগম, কোকিলের ডাক ইত্যাদি। এগুলি উদ্দীপন বিভাব। *মেঘদূত* পাঠকালে যে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার রস আস্বাদিত হয় তার আলম্বন বিভাব হল বিরহিণী যক্ষবধূ। আর বর্ষার আগমন ও মেঘের উদয় হল উদ্দীপন বিভাব। সমস্ত জটিলতাকে বাদ দিয়ে আমরা বলতে পারি কাব্যের ক্ষেত্রে বিভাব বলতে সহৃদয় পাঠকের মনে যে অলৌকিক রসানুভূতির সঞ্চার হয় তার কারণকে বোঝায়। বর্তমান আলোচনায় অনুভাব, ব্যভিচারী (বা সঞ্চারী) ভাবের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলে বাদ দেওয়া হল। বিভাবের এই প্রাথমিক অর্থ ছাড়া অভিধানে আর যেসব অর্থ পাওয়া যায় তা হল — চিত্তবৃত্তির উদ্দীপক বস্তু, বিশিষ্ট ভাব, পরিচয়, প্রেরণা।

উপরের আলোচনা থেকে বিভাবের যে অর্থ পাওয়া গেল তা থেকে বোঝা যাচ্ছে 'বিভাব কবিতা' নামে সংস্কৃত ভাষায় কোনও কবিতা ছিল না। অর্থাৎ এটিকে সাহিত্যের কোনও বিশেষ রূপ (literary type বা genre) বলে গণ্য করা যাবে না। তাহলে অলোকরঞ্জন বিভাব কবিতা পেলেন কোথায়? প্রবন্ধের ভূমিকাতে যে-কথা বলা হয়েছিল আবার আমাদের সেখানে ফিরতে হবে। অলোকরঞ্জন অনেক সময় কোনও শব্দকে নূতন অর্থ দান করেন বা তাকে নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেন। কখনও তিনি শব্দের অর্থটিকে সম্প্রসারিত করেন বা অর্থান্তর ঘটান। ভাষাবিজ্ঞানে যাকে semantic change বলে এক্ষেত্রেও তাই ঘটে। অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ আলোকরঞ্জনের এই রীতিকে শব্দের 'নবায়ন' বলেছেন। ভাষাতত্ত্বে একে neologism বলে। কাজেই এটি নতুন কিছু নয়। এই স্বীকৃত প্রথাকে অনুসরণ করে অলোকরঞ্জন বিভাব কবিতার ক্ষেত্রে 'বিভাব' শব্দটির নবায়ন করেছেন। সব দিক বিবেচনা করে বলা যায়, বিভাব কবিতা হল সেই কবিতা যা একটি কাব্যগ্রন্থের মূল ভাব বা বিশেষ ভাবকে ধরিয়ে দেয়, যা কাব্যগ্রন্থটির সঙ্গে পাঠকের প্রাথমিক পরিচয় ঘটায়, কাব্যের ভূমিকার কাজ করে বা যাকে কাব্যটির প্রবেশক বলা চলে।

অলোকরঞ্জনের বিভাব কবিতার সূত্র ধরে এবং আমাদের নিরূপিত সংজ্ঞার

আলোয় আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে অনুসন্ধান করলে এ জাতীয় কিছু রচনার হদিশ পেতে পারি। উপনিষদ্গুলি সাহিত্যরূপে রচিত না হলেও তাতে সাহিত্যগুণ যথেষ্ট আছে। এগুলির শুরুতেই যে শান্তিপাঠ থাকে তার উদ্দেশ্য ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) বিঘ্নের শান্তিবিধান করা। এগুলিও একধরনের ভূমিকা। উদাহরণ হিসেবে এখানে ঈশোপনিষদের শান্তিবচনটি উদ্ধৃত হচ্ছে :

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই মন্ত্রটি ঈশোপনিষদ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের শান্তিবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে একে ধাঁধার মতো মনে হয়। আক্ষরিক অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়াবে — 'ও পূর্ণ, এ পূর্ণ, পূর্ণ থেকে পূর্ণ উদ্গত হয়। পূর্ণ (অর্থাৎ কার্যব্রহ্ম) থেকে পূর্ণ গ্রহণ করলে পূর্ণই (অর্থাৎ পরব্রহ্মই) অবশিষ্ট থাকে। ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।' এখানে 'ও' আর 'এ' — এই দুটি সর্বনাম দিয়ে যথাক্রমে অদৃশ্য, কারণরূপে অবস্থিত ব্রহ্মকে এবং নাম ও রূপে অবস্থিত ব্রহ্মকে বোঝানো হয়েছে। উপনিষৎ আসলে ব্রহ্মবিদ্যা। তা যে গভীর ও রহস্যময় তা কি এই প্রহেলিকাময় শান্তিবচনেই আভাসিত হয় না? কোনও কাজ আরম্ভ করবার আগে মঙ্গলাচরণ করা ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি স্বীকৃত প্রথা। তাই যেকোনও বিষয়ের গ্রন্থ রচনাকালে লেখক প্রথমেই মঙ্গলাচরণ রচনা করতেন। আরব্ধ গ্রন্থ রচনার কাজ যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেজন্য রচয়িতা তাঁর ইষ্ট দেবতার বন্দনা করতেন। কখনও-কখনও গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উল্লেখও থাকত। কাব্য ও নাটকে তো বটেই, এমনকী দর্শনের বইতেও মঙ্গলাচরণ থাকত। অধিকাংশ মঙ্গলাচরণ থেকে অবশ্য গ্রন্থকারের উপাস্য দেবতা কে সেটুকুই জানা যায়। তাই সেসব গতানুগতিক মঙ্গলাচরণ বাদ দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের একটি মঙ্গলাচরণ দেখা যাক। কালিদাস রচিত কাব্যগুলির মধ্যে *রঘুবংশ*-ই শ্রেষ্ঠ। এটি অলংকারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। এর মঙ্গলাচরণও খুবই বিখ্যাত। কালিদাসের অন্য তিনটি কাব্যে (*ঋতুসংহার*, *কুমারসম্ভব*, *মেঘদূত*) কোনও মঙ্গলাচরণ নেই। *রঘুবংশ*-এর মঙ্গলাচরণটি এই :

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ॥

— শব্দ ও অর্থের সম্যক জ্ঞানের জন্য শব্দ ও অর্থের মতো (নিত্য) সম্বন্ধযুক্ত জগতের মাতা-পিতা পার্বতী ও পরমেশ্বরকে আমি বন্দনা করি।

এই মঙ্গলাচরণ যে কালিদাস শৈব ছিলেন শুধু তার অন্যতম প্রমাণ তা নয়, এর মধ্যে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের নিত্যতার কথাও তিনি বলেছেন। পার্বতী ও পরমেশ্বরের সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্যতার জন্য পুরাণে তাঁদের অর্ধনারীশ্বর বলা হয়েছে। ঠিক তেমনি শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধও অবিচ্ছেদ্য। শব্দের এবং শব্দার্থের নিত্যতার কথা মীমাংসা দর্শনেও স্বীকৃত। মল্লিনাথও তাই তাঁর টীকায় এ প্রসঙ্গে মীমাংসকদের কথা উল্লেখ করেছেন। পার্বতী ও পরমেশ্বরের সম্পর্কের সঙ্গে কালিদাস শব্দ ও অর্থের সম্পর্কের যে চমৎকার উপমা প্রয়োগ করেছেন তা 'উপমা কালিদাসস্য' — এই প্রচলিত উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করে।

পরবর্তী দু-টি শ্লোকে কালিদাস বিনয় প্রকাশ করে বলেছেন যে কোথায় সূর্য থেকে উদ্ভূত বংশ আর কোথায় তাঁর সীমাবদ্ধ বুদ্ধি। অজ্ঞানবশত তিনি ভেলায় চড়ে সাগর পাড়ি দিতে চেয়েছেন। দীর্ঘকায় ব্যক্তি যে ফলের নাগাল পেতে পারে বামন সেই ফলের জন্য লোভবশত হাত বাড়ালে যেমন হয়, মূঢ় হয়েও কবিখ্যাতি লাভেচ্ছু তিনি তেমনি উপহাসের পাত্র হবেন। পরবর্তী শ্লোকে অবশ্য তিনি সাফল্যের কিছুটা আশা প্রকাশ করেছেন যেহেতু তাঁর বাল্মীকির মতো পূর্বসূরি রয়েছেন। এরপর পঞ্চম থেকে নবম — এই পাঁচটি শ্লোকে কালিদাস সাধারণভাবে রঘুবংশের রাজাদের নানা কীর্তির কথা যা তিনি বলবেন ঠিক করেছেন তার উল্লেখ করেন এবং দশম শ্লোকে বলেন যে গুণদোষ বিচারের ক্ষমতা যাঁদের আছে সেই পণ্ডিতেরা তা শুনতে পারেন। কারণ সোনার বিশুদ্ধি বা খাদ আগুনেই পরীক্ষিত হয়। মঙ্গলাচরণসহ এই দশটি শ্লোককে মহাকাব্যটির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভূমিকারূপে গণ্য করা চলে। একাদশ শ্লোক থেকে মূল কাব্যের শুরু তাই প্রথম দশটি শ্লোককে কেউ বিভাব কবিতারূপে গণ্য করতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ এই দশটি শ্লোকের একটি সুন্দর অনুবাদ করেছিলেন।

সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি যেমন কালিদাস, তেমনি তাঁর শ্রেষ্ঠ টীকাকার হলেন মল্লিনাথ। কালিদাসের *ঋতুসংহার* বাদে বাকি তিনটি কাব্যের তিনি টীকা রচনা করেন এবং সে টীকাকে তিনি 'সঞ্জীবনী' আখ্যা দেন। *সঞ্জীবনী*-র যে মঙ্গলাচরণ তিনি রচনা করেন সেটিও একটি সুন্দর ভূমিকা। কিন্তু যেহেতু *সঞ্জীবনী* কোনও কাব্যগ্রন্থ নয়, তাই আমরা তার বিশদ আলোচনা থেকে বিরত থাকছি। একই কারণে বিভিন্ন নাটকের মঙ্গলাচরণ, প্রস্তাবনা, নান্দীপাঠ ইত্যাদির আলোচনা বাদ দেওয়া হল। সংস্কৃত ভাষার শেষ মৌলিক কবি জয়দেব। অনেকে তাঁকে বাঙালি মনে করেন। তাঁর রচিত *গীতগোবিন্দ*-র অন্তর্গত দশাবতার স্তোত্রকে অনায়াসেই একটি স্বতন্ত্র কবিতারূপে পাঠ করা চলে। *গীতগোবিন্দ*-র নায়ক কৃষ্ণ বিষ্ণুর অন্যতম অবতার। সুতরাং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যে বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারদের



কীর্তির উল্লেখ ও তাঁদের বন্দনা একটি সুরচিত ভূমিকার কাজ করে।

সংস্কৃত ছেড়ে আমরা এবার বাংলা সাহিত্যের দিকে চোখ ফেরাতে পারি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যেসব গ্রন্থ রয়েছে তার মধ্যে প্রাচীনতম হল চর্যাগীতি। সেখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোনও নিদর্শন নেই। চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব পদকর্তাগণ মূল গীতের পূর্বে একটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করতেন। আজ তাই বাংলা ভাষায় 'গৌরচন্দ্রিকা' শব্দের একটি অর্থ ভূমিকা। কিন্তু এই ভূমিকার সঙ্গে মূল গীতের তেমন কোনও বিষয়গত সম্পর্ক থাকত না।

বৈষ্ণব পদাবলি বাদ দিলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দু-টি গ্রন্থ হল কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত *চৈতন্য চরিতামৃত* এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত *চণ্ডীমঙ্গল*। *চৈতন্য চরিতামৃত* একাধারে চৈতন্যের জীবনী এবং বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস গ্রন্থারম্ভে সতেরোটি সংস্কৃত শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করেছেন। বিঘ্ননাশ ও অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য রচিত প্রতিটি শ্লোকের উদ্দেশ্য তিনি নিজেই বাংলা পদ্যে ব্যাখ্যা করেছেন। এইভাবে সমগ্র প্রথম পরিচ্ছেদটি তাঁর মঙ্গলাচরণ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বস্তুনির্দেশ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতাররূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তাই কৃষ্ণতত্ত্ব এবং আরও নানা প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা আরও নানা পরিচ্ছেদে করেছেন। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের অষ্টাদশ সংখ্যক পয়ারে আমরা চৈতন্যের জন্মকথা পাই : 'ফাল্গুন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়। সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়।।' চৈতন্যের জন্ম ও বাল্যলীলার আগের সমস্ত অংশটাই এক অতিবিস্তৃত ভূমিকা বলা চলে। আর দার্শনিক আলোচনা বাদ দিয়ে প্রথম দু-টি পরিচ্ছেদ (মঙ্গলাচরণ ও বস্তুনির্দেশ) যদি ধরা হয় তার আয়তনও কম নয়। এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি গ্রন্থ রচনা করতে হয়।

মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যের শুরুতে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর দেশ ও সমকালীন সমাজেরও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মূল কাব্যেও সমকালীন সমাজের যে নিপুণ চিত্র পাওয়া যায় তাতে এই অংশটিকে তাঁর মূল গ্রন্থের উপযুক্ত ভূমিকারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাগণ সকলেই মুকুন্দরামকে অনুসরণ করেছেন। তাই সেসবের আলোচনা বাহুল্য মনে করে পরিত্যক্ত হল।

আমরা এবার পরবর্তীকালের দু-জন বাঙালি কবির রচনা নিয়ে আলোচনা করব। প্রথম কবি মধুসূদন। তাঁর রচিত *মেঘনাদবধ কাব্য* বাংলাভাষার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য যার মহিমা বুদ্ধদেব বসুর তীব্র বিরাগ ও বিরূপ আলোচনাও এতটুকু ম্লান করতে পারেনি। এবছর এই মহাকাব্য রচনা ও প্রথম প্রকাশের দেড়শো বছর পূর্তি হল। এটি রচনার সময় মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে একজন গ্রিক এই মহাকাব্য লিখলে যেভাবে লিখতেন তিনিও সেভাবেই লেখার চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ *রামায়ণ*-এর কাহিনি অবলম্বন করলেও গঠনের দিক থেকে মধুসূদনের আদর্শ ছিল হোমারের *ইলিয়াড*। এই সূত্রেই বলা যায় পাশ্চাত্য মহাকাব্যের একটি স্বীকৃত ও অনুসৃত প্রথা হল 'invocation' বা কাব্যরচনায় সহায়তার জন্য দেবদেবীর আবাহন। এই আবাহনের মধ্যে বিষয়বস্তুর উল্লেখও থাকে। হোমার তাঁর *ইলিয়াড* শুরু করেছেন এভাবে : 'অ্যাকিলিসের রোষ হচ্ছে আমার বিষয়।' এরপর এই রোষের পরিণামে কী হয়েছিল অতিসংক্ষেপে তার উল্লেখ করে সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে (স্মর্তব্য যে হোমার তাঁর ইলিয়াড গান করে শোনাতেন, তাই মহাকাব্যের দেবীকে না ডেকে সংগীতের দেবীকে ডেকেছেন।) আবাহন করে বলেন : 'আসুন, নরপতি আগামেমনন ও পিলিয়ুস-পুত্র মহান অ্যাকিলিসের মধ্যে যে ক্রুদ্ধ বাগ্‌বিনিময় হয়েছিল তা দিয়ে শুরু করি। দেবতাদের মধ্যে কে ছিলেন এই কলহের পিছনে?' ইংরেজি সাহিত্যে মিলটনের *প্যারাডাইস লস্ট*-এর 'invocation' ছাব্বিশ পঙ্‌ক্তির এবং একটি স্বতন্ত্র কবিতারূপে পঠনীয়। সেখানে মিলটন heavenly Muse-কে আবাহন করে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন তাঁর বিষয়বস্তু এবং তাঁর এই মহাকাব্য রচনার উদ্দেশ্য ('...assert eternal providence, / And justify the ways of God to men.')।

মধুসূদন *মেঘনাদবধকাব্য* রচনার সময়ে এই পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ করে বত্রিশ পঙ্‌ক্তির এক দীর্ঘ আবাহন রচনা করেছিলেন। যার শুরু এভাবে :

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি?

অমৃতভাষিণী হচ্ছেন বাগ্‌দেবী সরস্বতী। সরস্বতীর বন্দনা দিয়ে শুরু করে, সেইসঙ্গে বিষয়বস্তু নির্দেশ করে মধুসূদন শেষ করেছেন কল্পনাকে আবাহন করে। তাকেও দেবীর আসনে বসিয়ে তিনি বলেছেন :

তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

এই আবাহনকে মিলটনের 'invocation'-এর মতোই আমরা একটি স্বতন্ত্র কবিতারূপে পাঠ করতে পারি যা মধুসূদনের মহাকাব্যের একটি চমৎকার ভূমিকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চতুর্থ সর্গের শুরুতে একটি সুন্দর বাল্মীকিবন্দনা রয়েছে। সেটিও ওই সর্গের উপযুক্ত ভূমিকা ('নমি আমি, কবি গুরু, তব পদাম্বুজে,... কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে!')।

বাংলা সাহিত্যে ভূমিকাসূচক বা প্রবেশক কবিতার শ্রেষ্ঠ রচয়িতা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর অনেক কাব্যের উৎসর্গপত্রে কবিতা লিখেছেন, প্রবেশক বা ভূমিকা হিসেবে কবিতা সংযোজিত করেছেন এবং অনেক কাব্যসংকলনের প্রথমেই ভূমিকাস্বরূপ নাম-কবিতাটিকে রেখেছেন। এগুলি নিয়েই একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। স্থানাভাবে আমরা কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করব। *মানসী* কাব্যের প্রথমে 'উপহার' শীর্ষক কবিতাটিই এ জাতীয় রচনার মধ্যে প্রথম। *মানসী* সেই কাব্য, যার সূচনায় কবি লিখেছিলেন, 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।' *উপহার* কবিতার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করা যাক :

সুখ দুঃখ গীতস্বর — ফুটিতেছে নিরন্তর —
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা।
বিচিত্র সে কলরোলে — ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চিরজীবন তাই — আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমের সীমা।
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, — তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

মনে হয়, শুধু *মানসী* কাব্যের নয়, এ যেন কবির সারা জীবনের কবিকৃতির ভূমিকা। কিংবা এর-ও আগে আছে *কড়ি ও কোমল*। তাতে কোনও ভূমিকা কবিতা নেই ঠিকই, কিন্তু এই কাব্যের প্রথম কবিতা হল *প্রাণ*। কবিতাটি সম্পর্কে সংকলনের প্রথমে 'কবির মন্তব্য'-তে কবি কী বলেছেন শোনা যাক :

এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টি প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বারবার প্রবাহিত হয়েছে —

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,

মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই —'

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের কাব্যসৃষ্টির অন্যতম প্রধান সুর তাঁর মর্ত্যপ্রেম। সেদিক থেকে এই কবিতাটিও তাঁর সমগ্র কবিকৃতির অন্যতম ভূমিকা যা পাঠককে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলে কবির কাব্যের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য। *চিত্রা* কাব্যের প্রথমেই রয়েছে নাম-কবিতাটি। কৌতূহলী পাঠক সেটি পড়ে দেখবেন এবং সেই সঙ্গে কবির লেখা 'সূচনা' যেখানে কবি বলেছেন —

> আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আমি এই বাণীর পন্থাতেই আমার পদ্য
> ও গদ্য রচনাকে চালনা করেছি —
>
> জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
> তুমি বিচিত্ররূপিণী।

এই কবিতাগুলি যেন রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবনের বা তাঁর সমগ্র কাব্যসৃষ্টির ভূমিকা। বিশেষ একটি কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে লেখা কবিতাও আছে। সেগুলি শিরোনামহীন এবং সংশ্লিষ্ট কাব্যের ভূমিকারূপে রচিত। যেমন *কথা* কাব্যগ্রন্থে, 'কথা কও, কথা কও। / অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে / কেন বসে চেয়ে রও?' যেহেতু প্রাচীন সব কাহিনির পদ্যরূপ দেওয়া হয়েছে এই কাব্যে তাই কবিতাটি খুবই সুপ্রযুক্ত। একই কথা বলা চলে পরবর্তী কাব্যসংকলন *কাহিনী*-র ভূমিকা কবিতাটি সম্পর্কে যার শুরু হয়েছে এভাবে, 'কত কী যে আসে কত কী যে যায় / বাহিয়া চেতনা বাহিনী,'। এরপর যে কবিতাটির উল্লেখ করব সেটি *শিশু* কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা কবিতা, 'জগৎ-পারাবারের তীরে / ছেলেরা করে মেলা। / অন্তহীন গগনতল / মাথার পরে অচঞ্চল, / ফেনিল ওই সুনীল জল / নাচিছে সারাবেলা। / উঠিছে তটে কী কোলাহল — / ছেলেরা করে মেলা।' *শিশু* কাব্যের ভূমিকা হিসেবে যেমন, একটি স্বতন্ত্র কবিতারূপেও এটি চমৎকার। রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্যগ্রন্থের প্রথমে সন্নিবিষ্ট নাম-কবিতাগুলিও ভূমিকা শ্রেণির। যেমন *পলাতকা, পূরবী, নবজাতক* ইত্যাদি। মোটের উপর সংখ্যা, গুণগত মান ও প্রাসঙ্গিকতার বিচারে রবীন্দ্রনাথ রচিত ভূমিকা কবিতাগুলি এমন এক সমুচ্চ শিখর স্পর্শ করে আছে, যা অনতিক্রম্য।

বিভাব কবিতার যে সংজ্ঞা আমরা নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছি তার আলোকে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য থেকে যে নিদর্শনগুলি উদাহৃত হয়েছে তাদের আশা করি 'বিভাব কবিতা' বলা চলে। এগুলি সবই সংশ্লিষ্ট কাব্যের মূল সুর বা বিশেষ ভাবকে ধরিয়ে দেয়, তার একটি সুরচিত ভূমিকা বা প্রবেশকের কাজ করে; যদিও এই কবিরা কেউই তাঁদের লেখাগুলিকে 'বিভাব কবিতা' হিসেবে চিহ্নিত করেননি।

সেকাল থেকে একাল : পট, পটভূমি ও বিবর্তন

সোমব্রত সরকার

প্রথম 'বিভাব কবিতা'-র সূত্রপাত কার হাত ধরে ঘটেছিল সেটা এখন যথার্থ গবেষণার বিষয় হলেও আমার মতে, এ নিয়ে গবেষণার কী বা আছে! তার নাম নিয়ে, উৎপত্তি নিয়ে নানা আলোচনা প্রতি-আলোচনা চলতে পারে। আভিধানিক গণ্ডি টপকে বিভাব কবিতা সম্পর্কে তবে কিছু বলতে গেলে বলতে হয় : এ হল আসলে কাব্যগ্রন্থটিকে একটি ঐকমত্যে বেঁধে দেওয়ার প্রচেষ্টামাত্র। যা গ্রন্থটির পক্ষে সবচেয়ে জরুরি বিষয়ও বলা যেতে পারে। অনেকেই বলেন, 'বিভাব কবিতা' শিরোনামটি নাকি অলোকরঞ্জনের মস্তিষ্কপ্রসূত। তিনিই এই অভিজ্ঞানপত্রের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কখনও কিছু বলেছেন বলে মনে হয় না। আর বলে থাকলেও তা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। যতদূর জানি, লিখিত আকারে এ নিয়ে তাঁর কোনও বয়ান নেই। ব্যাপারটিকে তাহলে শ্রুত ইতিহাসের পর্যায়ে অনায়াসে ফেলা যেতে পারে।

এক্ষেত্রে যেটা বলার, 'বিভাব কবিতা'-র শিরোনাম দেওয়া না-দেওয়াটিকে শ্রুত ইতিহাসে চালান করে নিলেও তার যে একটা বাতাবরণ বাংলা কবিতার ইতিহাসে ভীষণরকমভাবেই চালু ছিল সেটা কিন্তু একেবারে কোনওভাবেই অস্বীকারের জায়গা নেই কোনও। কেননা 'বিভাব'-এর মূল অর্থ করা যেতেই পারে রসোদ্দীপক আশ্রয়ণ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ 'বিভাব'-এর অর্থ করা হয়েছে : যাহা সামাজিকের রত্যাদির বিভাবয়িতা, অর্থাৎ রত্যাদির আস্বাদাঙ্কুরের উদ্বোধক বা প্রাদুর্ভাবকারক; রসোদ্দীপক আলম্বনাদি; রত্যাদির উদ্বোধক বিষয়। একটু খেয়াল করলেই দেখব 'বিভাব'-এর এইসব বিষয়আশয়ের দেখা কিন্তু প্রথম মিলেছিল আমাদের বৈষ্ণব কবিতায়। সেখানে পদকর্তারা তাঁদের পদাবলির সূচনায় কাব্যাংশ বা বিষয়াংশের এমন উদ্দীপিত ঐশ্বর্যকে প্রতিস্থাপন করতেন যা রসোদ্দীপক আশ্রয়ণকেই কেন্দ্র করে সঙ্গীতের আস্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগের প্রক্রিয়া ও পরিণতির মতোই বিবর্তিত হত। আর পদাবলির কবিতাতে তো আমরা ধ্বনিমাধুর্যের কলকাকলিকে কোনওভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যে যেসব অনুরাগ পর্বের বর্ণনা করেছেন মূলাংশে যেতে গিয়ে, সেগুলোকে তো বিভাব লেখা হিসেবে একেবারে সদর্থক অর্থেই দেখা যেতে পারে। 'নায়িকার পূর্ব্বরাগ'-এ অনুরাগ পর্বে প্রথমেই তিনি লিখেছেন : 'বেলা অবসানে সখীর সহিতে / গেলুঁ যমুনার জলে। / নয়নহিলোলে কিরূপ দেখিলুঁ / পরাণ চঞ্চল হৈলে॥' তাঁর এই পরানচঞ্চলতাকেই তো তারপর আমরা দেখি আনুষঙ্গিক অর্থে দানা বাঁধতে। অনুরাগ পর্বে এই পদকে কবি ধানশ্রী রাগে গীত হওয়ার জন্যই সূচনায় ধানশ্রীর উল্লেখ রেখে দিয়েছেন। বিদ্যাপতি আবার তাঁর কাব্যগীতে বন্দনা অংশ পেশ করেছেন মূলানুগে আসতে গিয়ে। লিখেছেন : 'নন্দক নন্দন কদম্বেরি তরুতলে / ধীরে ধীরে মুরলী বলাব॥ / সময় সঙ্কেত নিকেতন বইসল / বেরি বেরি বোলি পাঠাব।' তাঁর এই বোলি পাঠানোর সার্থক সূত্রমুখ হিসেবে বন্দনা অংশটিকে বিভাব কবিতা হিসেবে দেখা যেতেই পারে। জ্ঞানদাসও তাঁর পদাবলিতে গৌরচন্দ্রিকা অংশটি রেখেছেন। সেখানে একেকটি পদের সূচনায় রাগ-রাগিণীর উল্লেখ পর্যন্ত করে গিয়েছেন গীতরূপেরই যথেষ্ট সুবিধার্থে। প্রথম পদেই গীতরূপেরই জন্য সিন্ধুড়া রাগের উল্লেখ রেখে তিনি লিখেছেন : 'কনক কিশোর বয়স অতি রসময় / কিয়ে নব কুসুম ধনু। / লাবণ্য সার কিয়ে সুধা নিরমিত / গৌর সুললিত তনু॥' তারপরই গৌরকিশোরের সুললিত তনু প্রশ্ন ও অপরাপর জরুরি অনুষঙ্গেই আবর্তিত হয়েছে বলা যায় বাকি পদাবলিগুলো জুড়ে। যার স্বীকৃতির উৎসর সঙ্গে জুড়ে নেওয়া যেতেই পারে আমাদের পদাবলি স্বরালাপেও সেই বিভাব কবিতাকেই। গোবিন্দদাসও তাঁর পদাবলি বন্দনা অংশ দিয়েই শুরু করেছেন। সেখানেও তিনি রাগরূপকে আলো করেই রেখে গিয়েছেন। লিখেছেন : 'চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল / জিতল গৌরতনুলাবণী রে। / উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব / জগমনোমোহন ভাঙনী রে॥'

চণ্ডীদাসের রাধারূপের বাচনিক ভঙ্গিমার এবং বিদ্যাপতির কৃষ্ণ আর স্বাভাবিকভাবে চৈতন্যপরবর্তী কবিদের শ্যামসম গৌরসুন্দরের প্রতিতুলনার যেসব মোহনমূর্তিতে বাংলা কাব্য জারিত হয়েছে তার সূত্রপাতে যে সংবেদন ও বোধের মাঝখানে তুলাদণ্ড হিসেবে অনুভূত বিচ্ছুরিত পরস্পরপ্রতীপ যোজনাই বলা ভালো, আধুনিক প্রতিতুল্যে বিভাব কবিতা হিসেবে জুড়ে গেছে। বাংলা কাব্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণে, মঙ্গলের ক্ষেত্রে মনসা-চণ্ডীর যেসব প্রতিক্রিয়া সর্বাত্মক গৃহহীনতা ও অভিব্যক্তিবাদী — ইংরেজিতে বললে বলতে হয় Expressionist দিয়ে আখ্যানাংশ শুরু হয়েছে তার উদ্‌যাপনের প্রথমভাগেই অলক্ষ্যে জায়মান হয়ে উঠেছে এখনকার এই অতীন্দ্রিয় উত্তরণের আচ্ছাদনে ইন্দ্রিয়বিবেকী সেই একই আয়োজন। যার নাম ঘটা করে দেওয়া হয়েছে 'বিভাব কবিতা' বলে। ভারতচন্দ্রও তাঁর *অন্নদামঙ্গল*-এ অন্নদামাহাত্ম্যের সূচনায় যে গণেশাদি দেব-বন্দনা জুড়ে দিয়েছেন তা তো গোটা কাব্যকেই আসলে ক্রমবিস্তারী থিমে ধরে দেওয়ার প্রয়াস।

বিভাব কবিতার তাৎপর্যময় বিষয়বস্তু বা গতিপরিণতি এই ঐন্দ্রজালিক আলোকচিত্রনকেই বলা যায় ফুটিয়ে তোলে। বিভাব কবিতাকে বলা যেতে পারে চিত্রচেতনা। রফানিষ্পত্তি। আলংকারিক সিদ্ধরসের নান্দনিক সৌকর্যভাবনা। কবি-অভিপ্রায় এখানে নিজেকে উপচেতন আধার করে নিয়ে একটি সর্বান্বয়ী বীক্ষণকেই বিদ্ধ করা। যা স্বদীক্ষিত মুহূর্তকেই এমন কয়েকটি ক্ষণোদ্‌ভাস সেই শীর্ণ চয়নের ভেতরে — থাকে আমাদের অভিনিবেশের প্রস্বর হিসেবে নিবদ্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। যার প্রয়োজনীয়তা বাংলা কাব্যের একেবারে সেই উদ্ভবকাল হতেই ছিল।

প্রথম মান্য পুথির পাতা ছিল তো আসলে সংকলিত তবে তাতেও পদ সংকলনের সময় হরপ্রসাদ লুইপাদের পটমঞ্জরী রাগের যে দোহাটি দিয়ে শুরু করেছেন তাতেও ভালোভাবে খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে বিভাবের একটা সূত্রমুখ যেন আপনাআপনিই গ্রথিত হয়ে রয়েছে। বিভাবকে চিত্রচেতনার চরমত্ব দিয়েছি আমরা, আলংকারিক রসের অনূদিত শিল্পরূপেরও দাবি তুলেছি সেই চরমত্ব বা দাবির অভিমুখে 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল। / চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥' সাজালে আমাদের পঞ্চশাখাবিশিষ্ট তরুর মতো দেহের পাঁচটি মন প্রকৃতি-আভাসেই যে প্রতিভাত হয়। যা আভিধানিক 'বিভাব'-এ সামিল হয়ে পড়ে। বিভাব হল সেই অনায়াস সৌন্দর্য, ঘনীভবনের প্রচ্ছায়া যা কাব্যকে নতুনতর প্রচ্ছায়া সঞ্চারের দিকেই *ঠেলে* দেয়। আধুনিক কবি একে কেবল তাঁর কাব্যের নান্দনিক বিবেচনার এমন এক প্রতিবন্ধক করে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন গ্রন্থের উদ্বোধিত মনস্তত্ত্ব যা পড়লে আমাদের কবিরই নিজস্ব চৈতন্য ও হৃদয়ের সংশোধনে-সংশোধনে জর্জরিত সুগঠিত জগতটির ছায়াপাতেরই দেখা মেলে। যে ছায়া বিবৃতিজ্ঞাপনের বিহ্বলতায় সামগ্রিককে অংশময় সুন্দরের একেবারে বৃহৎ বিশ্বকোষজনিত সংজ্ঞাভুক্তির বিদগ্ধ একমুখী বাগ্মিতার দিকেই *ঠেলে* দেয়। যা গ্রন্থটিকেই আসলে নির্মমভাবে পরিমার্জনা করে, একদেশস্পর্শিতার কালবেলাকে বিভাবিত করে। আর এখানেই যেন 'বিভাব'-এর দোলনস্পন্দটি ফুঠে ওঠে। তাই আমার মতে, বিভাব কবিতা হল সেই অনিশ্চিতির জগতেরই সৃজন যার সমীক্ষণ করতে আশাবাদ কিংবা নৈরাশ্যবাদ কোনওটিকেই ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ তাত্ত্বিকতার মধ্যে এনে ফেলা যায় না। অলোকরঞ্জন যখন *যৌবনবাউল*-এর বিভাবে লেখেন :

ধরিত্রীর নীবিবন্ধে   জগৎ যদি মহানন্দে
অন্ধ, আমি প্রহরী যন্ত্রণা
মানুষ গিলে নামের খনি,   আমার পরে এই ধরণী
সঙ্গোপনে অলোকরঞ্জনা॥

তখন সেখানে যে স্বরচিত পটভূমিকার জটিল সমন্বয়ের চাহিদার তরঙ্গ-জ্যামিতি নির্ধারিত হয় তা কাব্যেরই সামগ্রিক ইন্দ্রিয়ভাবনা। *যৌবনবাউল*-কে আমি অন্তত এভাবেই দেখি। আবার *সুখ-দুঃখের সাথী*-তে উৎপলকুমার বসু লেখেন :

সুখ-দুঃখের সাথী, তুমি আমার সঙ্গে চলো।
বাতাস বইছে বেরিয়ে পড়ার বাতাস, গাছের কাছে বলো
আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুক, পথের কাছে বলো
আমায় ফিরতে অনেক রাত্রি হবে — যেন অপেক্ষা না ক'রে
সদর দরজা বন্ধ করে।
তুমি গাইতে পারো গান
কিন্তু সে গান মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। তুমি অনেক রূপকথা
মাথার মধ্যে বয়ে বেড়াও — কাকে বলবে? শুনবে কারা?
শোয়ার আগেই ঘুমে ঢুলছে মানুষ-জন, পশু ও পাখি, চন্দ্র, তারা
এমনি করেই জীবনভর কত সময় নষ্ট হল।
এবার সুখ-দুঃখের সাথী, তুমি অন্য কোথাও চলো।

গ্রন্থের মধ্যে এই মুক্তিবোধের দিকে নিয়ে যাওয়া মন্ত্রের অণিমাকে উৎপল অবশ্য 'বিভাব কবিতা' নামের অনুমণ্ডল থেকে বের করে নাম দিয়েছেন 'ভূমিকা'। তিনি তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতা, কাব্যসংগ্রহ*-এর মধ্যেও ভূমিকা হিসেবে যা লিখেছেন আর যেভাবে কবিতার একচ্ছত্রতায় তাকে শ্রুতি বিস্মৃতির নিস্তব্ধতা ভেঙে এনে মিশ্র অধিষ্ঠানে চঞ্চল করে দিয়েছেন তাকে বিভাবের মুকুরিত লক্ষ্য ছাড়া আমরা কী বা বলতে পারি?

প্রাচীন মান্য বাংলার পুথি থেকে পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন কাব্য, নাথ উপাখ্যান, ভারতচন্দ্রের আখর, সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের রচনা, শাক্ত পদাবলি, গাথা সাহিত্য, ময়মনসিংহ গীতিকার সংকলিত নিরূপণে আখ্যানধর্মীতার ভেতর আদিপর্ব বা সূচনায় যে বাষ্পবিধুর ধোঁয়াটে বিহ্বলতার স্বনিকেত আধার — আমাদের মহাকাব্যও যার ছাড় পায়নি, সবই তো সর্বান্বয়ী প্রতীকী উদ্যমের নিহিতার্থ বিভাব নিয়েই অন্তর্বৃত পরিসরের মধ্যে থেকেই গ্রন্থের অনপনেয় সচেতনতায় তার গতিপ্রকৃতিকেই স্থির ও নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। যা বিভাবের মূল সাঙ্কেতিক সাজ-সরঞ্জাম বলে আমরা মনে করতেই পারি। সুতরাং বিভাব কবিতা লেখার যে আর্কেটাইপ ও মননমুদ্রা আমাদের তা বাংলা কবিতার পৌনঃপুনিক সেই পরম্পরার ভেতর ধারাবাহিকতার ধরনটা নিয়ে সুপ্ত স্পন্দমানে ছিলই। যেহেতু সেখানে, সেকালে আখ্যানের ভরকেন্দ্র অণু থেকে অনন্তের মধ্যে স্পন্দমান ছিল তাই বিভাবের রেখারীতি সেখানকার অপরিসীম আয়তনে সম্প্রসারণের বাঁকে-বাঁকেই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠেছে। আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে তা মধুসূদনের কাব্য থেকেও বাদ পড়েনি। তারপর মহাকাব্যের অনুসরণে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেনদের যেসব লেখালেখি তার সূচনালগ্নে বিভাব কবিতার সেই বর্তমান অভিক্ষেপটি বলা যায় যে একেবারে অতীন্দ্রিয় হানাদারের মতোই ঢুকে পড়েছিল তবে এখনকার দুর্জয় আশাবাদ এবং দুর্জ্ঞেয় শঙ্কাতুরতার মধ্যে কেঁপে ওঠা আলোড়নে তা কখনওই ছিল না। বাংলা কবিতা যাঁর হাতে পড়ে কবিতার শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আদায় করে নিয়েছিল সেই মানুষটিও কি কখনও সেই অর্থে বিভাব কবিতা লিখেছিলেন?

উত্তরে বললে বলতে হয় *মানসী*-তে কবিতার সূচিতে যাওয়ার আগে 'উপহার' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তা তো আসলে গ্রন্থেরই অমীমাংসিত বিপন্নতা। তা কি বিভাব নয়? উত্তরকালীন পরিক্রমার দিগ্বলয়ে সূচিত সেই সঞ্চারিত বলাকা বলা চলে রবীন্দ্রনাথেরই হাতে পড়ে ডানা মেলেছিল। *মানসী*-র সেই 'উপহার'-এ তিনি লিখেছিলেন :

নিভৃত এ চিত্তমাঝে   নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই   মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর   ফুটিতেছে নিরন্তর —
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা।
বিচিত্র সে কলরোলে   ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চিরজীবন তাই   আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমের সীমা।
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে,   তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

বলতে পারি আমরা বিভাবের এই সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় জেগে থাকা প্রচ্ছন্নতার ঝোঁককে রবীন্দ্রনাথই উপচেতন অস্তিত্বের লীলা পরিসরে নির্মুক্ত করে দেওয়ার কথা বোধহয় ভেবেছিলেন। *মানসী*-র পর *চৈতালী*-তে এসে তাই তিনি গ্রন্থের প্রকাশ্যতায় একেবারে সাদা পাতায় যা লিখলেন তা উৎসর্গস্থানে এলেও বিভাব ছাড়া আর কী!

তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি,
তোমার আনন্দমূর্ত্তি নিত্য হেরে যদি

এ মুগ্ধ নয়ন মোর, — পরশ-ব্যাকুল,
তোমার কোমলকান্ত চরণ পল্লব
চিরস্পর্শ রেখে দেয় জীবন তরীতে, —
কোনো ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।

এভাবে কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ পাতায় রবীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝেই যা যেভাবে লিখে গেছেন তা অলক্ষ্যে হঠাৎ জায়মান বিভাব কবিতার নিজস্ব ভঙ্গিকে তুলে ধরে। সালতামামির হিসেবে এলে এর আবির্ভাব ঘটেছিল সদর্থক অর্থে বললে পঞ্চাশ দশকে। তবে কল্লোলীয় কবি অজিত দত্তের *কুসুমের মাস* খুলে নিয়ে বসলে বিভাবের জায়গায় চোখে পড়ে বিদ্যাপতির চারটি লাইন :

চল দেখনে যাই ঋতু বসন্ত।
জহাঁ কুন্দকুসুম কেতকী হসন্ত॥
জহাঁ চন্দা নিরমল, ভমর কার।
রজনী উজাগরী, দিন আন্ধার॥

...যা *কুসুমের মাস*-এর উত্তেজিত অমোঘ সূর্যমুখিতাই আসলে। মনে হয় অজিত দত্ত তাই আর নিজস্ব অভিধায় কিছু লিখবার সেই বিভাব আধারকে এভাবেই ভরিয়ে তুলেছেন অপর কবির সার্থক গ্রহণযোগ্যতার প্রাসঙ্গিক নান্দনিক প্রয়াসে। তবে এরকম প্রয়াস পরবর্তীতেও আছে ভীষণই আলো করে জয় গোস্বামীর *কবিতাসংগ্রহ*-এ। সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহু আলোচিত শঙ্খ ঘোষের মন্ত্রাচ্ছন্নতা :

এত যদি ব্যূহ চক্র তীর তীরন্দাজ, তবে কেন
শরীর দিয়েছ শুধু, বর্মখানি ভুলে গেছ দিতে!

তবে এই দুই গ্রন্থে ব্যবহৃত বিভাব বলে যাকে আমরা শিরোধার্য করেছি, তা কিন্তু সেই রবীন্দ্র পরম্পরার উৎসর্গ লেখায় জুড়ে রয়েছে আশ্চর্য নামহীনতায়। যা গ্রন্থ-অস্তিত্বকে ভাবক্রম আর কালক্রম দুটোই দিচ্ছে। তাকে তাহলে 'বিভাব লেখা' ছাড়া আর কী বা বলতে পারি। পঞ্চাশের শঙ্খ ঘোষ, উৎপল, শক্তি, অলোক, আলোক — সকলেই কম-বেশি বিভাব লেখা লিখেছেন। তবে উৎপল আর আলোকেরই মাত্রাধিক্যতা এখানে বেশি। ষাটের দশকে কালীকৃষ্ণ গুহর প্রায় প্রতিটি বইতেই রয়েছে বিভাব লেখা। সত্তরের এক বিভাব লেখা বহুশ্রুত কবিতাতেই এখনও আপাত-অটুট দাঁড়িয়ে আছে। হৃদি ভেসে যাওয়ার সেই অলখ উপাখ্যান সার্থক কবিতা হয়েই রয়েছে বাংলা কবিতার সৃষ্টিবৈচিত্র্যে। ঠিক যেমনভাবে রয়েছে বহুশ্রুত আরও দুই পঞ্চাশের বিভাব। 'ভোর এল ভয় নিয়ে, সেই স্বপ্ন ভুলিনি কখনো'। আর সেই দারুণ স্পর্ধাঅটল কথা : 'ভগবানের গুপ্তচর মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর / ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না'। আশির দশকে মেয়েদের লেখালেখিতে সদর্থক সব এমন বিভাব আমরা লক্ষ করি যা হয়তো বা কবিতারই 'অর্ধেক পৃথিবী' দাবি করে বসে। চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন : 'এই দরদালান ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত, ফাটলে ফাটলে কীট- / দংশন তক্ষক গর্জন নিয়ে এতে বিরাজ করি, বর্ষাতে স্নান-ধর্ম / বুঝে নিই, অপেক্ষায় থাকি আকাশে বিমান-যাত্রার'। সংযুক্তা লেখেন : তাহলে কীভাবে আর তোদের শোনাব রূপকথা, / যদি না বোঝাতে পারি পরে আমরা কোনদিকে যাব — / পায়ের পাতায়, বুকে, বিঁধে নেব কাঁটা ও পুরুষ / আমরাই রাক্ষুসি হব, সৎমা হব, গড়ে তুলব ডাইনি-গোপনতা'। আশির দশকেই মেয়েদের কাব্যগ্রন্থগুলোতে বিভাবের আচ্ছন্ন নৈঋত আমরা বেজে উঠতে দেখি। সত্তর পর্যন্ত তাঁদের অনমনীয় অভিঘাতের অন্তর্জগত এভাবে সূক্ষ্ম পরম্পরা নিয়ে বিভাবে অন্তত আসেনি। রাজলক্ষ্মী দেবী থেকে শুরু করে, দেবারতি মিত্র, গীতা চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসুরা তাঁদের গ্রন্থে বিভাব সংযোজন কিন্তু করেননি। আর আশি থেকেই আরেকটি বিভাব প্রবণতা আসে তা হল গ্রন্থকে ভাগ করে দুই বা তিন পর্বে আলাদা শিরোনামে রেখে পর্বে-পর্বে নির্দিষ্ট বিভাব জুড়ে দেওয়া। সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা*, শ্রীজাতর *ছোটদের চিড়িয়াখানা*, হিন্দোল ভট্টাচার্যের *তুমি, অরক্ষিত*-তে এরকম একগ্রন্থে দুই-এর অধিক বিভাবের দেখা মেলে। নব্বই দশকে মন্দাক্রান্তা সেনের বিভাব লেখাই গ্রন্থনাম হয়ে ওঠে — *হৃদয় অবাধ্য মেয়ে*। অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক লাইনে বিভাব লেখেন : 'তুমি, গোপনীয়সমূহের মধ্যে মৌন'। নব্বই থেকেই যেন প্রায় সব গ্রন্থেই বিভাব জুড়ে দেওয়ার প্রবণতা বেশি মাত্রাতে দেখা দেয়। তার ফলে অনেক গ্রন্থের অবস্থা বর্তমানে এমন দাঁড়ায় যে বিভাব দিতে হবে বলেই যেন দেওয়া। বিভাব স্টাইল। প্রথা। বিভাবের ধ্রুপদী ভাষাক্রম, কার্যকারণসম্পর্ক হারিয়ে ফেলে এখনকার অনেক গ্রন্থে এমন এক জিজ্ঞাসা ও পূর্ণচ্ছেদের অমিত ঔৎসুক্য তৈরি হয়ে পড়ে — মনে হয় মূল বই-এর যে স্বরোত্থান বিভাবে তা কোথায়? অনেকেই বিভাবের খচিত যে চমৎকারিত্ব তাই-ই বোধহয় ধরতে পারেন না। যেকোনও একটি পছন্দসই কবিতাকে বিভাব হিসেবে চালিয়ে দিলেই যেন হল। যেহেতু প্রচলন। না-থাকলে মান থাকে না যেন। তাঁরা বুঝতে পারেন না, বিভাবের ওপর গ্রন্থের জাতে-ওঠা কখনও নির্ভর করে না। এখনও বিভাবের এই প্রবল দাপাদাপিতে এমন কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হয় যেখানে বিভাব নেই, অথচ তা একটি সার্থক পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ।

বিভাব তো আকস্মিক ঢৌল নয় কোনও। বিভাব হল আমার মতে সুমিত সম্মতি গৃহীত প্রদত্ত ভাববস্তুর যা গ্রন্থের অংশ-প্রত্যংশকে দুমড়ে-মুচড়ে আরও ঝঙ্কৃত শক্তিসম্পন্ন একত্র পূর্ণতায় ভরিয়ে তোলে। বিভাব কবিতা আমার যুক্তিতে ধ্রুব প্রবহমান সংবেদনের অগোচরতম স্তর যা গ্রন্থটিকে এক রহস্যময় ঠাসবুনুনি দেবে। সে বুনুনি এখনকার বিভাবে কোথায়? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা একেবারে অনুপস্থিত। আসলে এখনকার অনেক কবিই, বলতে আমার কোনও বাধা নেই, বিভাবের সুকীর্তিত অতীতের দেবায়নকে একপাশে সরিয়ে কেবল ভাবেন, বিভাব হল কেবল সমকালের গ্রন্থের এক আলোড়ন। তাই কবিকে সেখানে আলোড়িত হতেই হয়। ফলস্বরূপ নির্বাচিত কবিতার একটি জুড়ে যায় কাব্যগ্রন্থের বিভাব লেখায়। তার অর্থগত যে রসোদ্দীপক আশ্রয়ণ তা সেখানে হয়ে পড়ে ভীষণভাবে অনুপস্থিত। বিভাব তখন তাই হয়ে ওঠে কেবল অভিনবত্বের রফানিষ্পত্তি। সার্থক কবিতার ইন্দ্রিয়সঞ্চার সেখানে থাকে না। থাকে না গ্রন্থের ঐকতানের স্থানিক প্রতিভাস। তাই বিভাব লেখা নিয়ে আবার নতুন করে ভাবনার বোধহয় সময় এসেছে। না হলে বিভাব কবিতার স্বপ্নপ্রয়াণ আর বেশি দূরে নয়।

অলোকরঞ্জনের একগুচ্ছ 'বিভাব' কবিতা

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

তবু খুঁজেছিলাম সত্তার শাশ্বত
আলম্বন বিভাব, নিছক হৃদয় এবং ইন্দ্রিয় পার হয়ে
বিভাব

কোনো পথ-চলতি সংলাপিকার টুকরো, প্রিয় কোনো পুঁথির একটি বর্ণনাংশ, বাক্-ছন্দের ঢৌল অথবা স্পন্দমান একটি প্যাটার্ণের সন্ধান — এই সমস্তই, এবং এদের সঙ্গে চক্রান্তরত যাপিত জীবনের বিভাব —ঐ পটভূমিকায় অনুস্যূত হতে পারে।

মুহূর্ত এবং পটভূমি / দ্বিতীয় ভুবন

কবি এখানে সমস্ত ব্যাপারটার দর্শক মাত্র, তিনি একটি বিড়ালকে বিভাব করে এই কবিতাটি লিখেছেন।

দ্বিতীয় ভুবন / ঐ

ভাবতে ইচ্ছে করছে আনুষ্ঠানিক কর্মসূত্রে বস্টন-বসতির অবসানে এই
কবিতাটির বিভাব সূচিত।

একটি কবিতার জন্ম : ৩ / স্থির বিষয়ের দিকে

গদ্যে এবং কবিতায় অনন্য প্রয়োগে অলোকরঞ্জনের আগে 'বিভাব' শব্দটির এমন বিদগ্ধ ব্যঞ্জনা আমরা আর পেয়েছি কি? অলংকারশাস্ত্রে যে শব্দটি অস্তিত্বহীন ছিল, তা নয়, কিন্তু এর ব্যবহারযোগ্যতা বিষয়ে কেউই তেমন আস্থাশীল হতে পারেননি, পারেননি সাহসে আর সপ্রতিভতায় শব্দটির মধ্যে সেই বাঞ্ছিত আভিজাত্যের সঞ্চার করতে। বিষয়-উদ্দীপনা সম্পর্কিত শব্দটি কবিতার অনুষঙ্গে নিশ্চয়ই অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে, একটি সমগ্র কবিতাগ্রন্থের উদ্ভাসক ভাবনা থেকেও সম্ভাবিত হতে পারে 'বিভাব' কবিতা, কিন্তু গদ্যের শরীরেও যে শব্দটিতে যুক্ত করা যায় অন্যতর মাত্রা, 'দ্বিতীয় ভুবন' এবং 'স্থির বিষয়ের দিকে' তার সাক্ষ্য দেবে। বর্ণহীন ভূমিকার বদলে 'বিভাবসূত্র' লিখতে তিনি স্বস্তিবোধ করেন বেশি। আসলে শব্দটির প্রতি অলোকরঞ্জনের একধরনের অমোঘ দুর্বলতাও অপ্রকাশ থাকেনি কোথাও। 'বিভাব' নামাঙ্কিত কবিতাও যেমন তাঁকে লিখতে হয়েছে একদিন, 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে' সমৃদ্ধ হয়েছিল সেই কবিতায়; তেমনি ধারাবাহিক প্রথায় তাঁকে প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাগ্রন্থের উদ্বোধনে লিখতে দেখেছি এই 'বিভাব' কবিতাপুঞ্জ। গ্রন্থচরিত্র অর্জিত হয়ে গেছে এই মিতবাক ফসলগুলি থেকে, বিভাব-নিহিত উদ্দীপক ভাবনাই প্রস্বরিত হয়েছে এক-একটি গ্রন্থের যাবতীয় অবশিষ্ট পাতার ক্রমিক নির্মাণে। অলোকরঞ্জনের এই মৌলিক রেওয়াজই বলতে পারি সংক্রামিত হতে দেখেছি সাম্প্রতিক অনেক কবির অনুচর্চায়।

১৯৫৯-এ তাঁর আত্মপ্রকাশ 'যৌবনবাউল' দিয়ে। সেই সূচনাতেই লগ্ন হয়ে আছে একটি ছন্দোময় বিভাব-কবিতা। আরম্ভিক প্রয়াসপর্বে যেহেতু আঁটসাট ছন্দের প্রাবল্য ছিল, তাই এ কবিতায় প্রথাসিদ্ধ প্যাটার্ণই অনুসৃত হয়েছে :

গঙ্গা জলে উঠুক পাপ		সূর্য হোক অপ্রতাপ
সকালে আমি কিরণ বিকাবো না।
ভগবানের গুপ্তচর		মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর
ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না।

এই ছন্দের গঠনে কোনও পর্যায়ে আর কি তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন? করেছেন হয়ত বা দু-একবারই। কিন্তু পর্বান্তরেও তিনি যে ছন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাননি, তার সাক্ষ্য দেবে তাঁর সাম্প্রতিকতম কবিতাকৃতিও। ছন্দের চর্চা করায়ত্ত করেই তিনি শুরু করেছিলেন একদিন, শব্দের অপ্রচল প্রয়োগে সিদ্ধি অর্জন করতে চেয়েছিলেন প্রথম থেকেই। ১৬ লাইনের কবিতাটিতে 'অপ্রতাপ', 'অপ্রসর', 'মরণমদমাতাল ডোম' শব্দগুলি আমাদের ঘাড় ঘুরিয়ে দিয়ে প্রথম দৃষ্টি দাবি করেছিল; আমরা আরও সচকিত হয়ে উঠেছিলাম তাঁর সাহসী বাগ্‌বৈভবের এক টুকরো পেয়ে :

মানুষ গেলে নামের খনি,		আমার পরে এই ধরণী
সঙ্গোপনে অলোকরঞ্জনা।

সেই শুরু, তারপরে ক্রমিক সম্প্রসারণ। ওই বইতেই ছড়িয়ে ছিল 'অনার্দ্র আর্দ্রতা', 'হিমার্ণব', 'বিভোরবিভা', 'ঘুমনিবিড়', 'অগুরু গন্ধের বৃষ্টি', 'অণুমঞ্জরী', আনম্রঅঙ্কুর'-এর মত সচিত্রসংবেদী শব্দমালা। এদের প্রাচুর্যে একদিকে চিহ্নিত হয়েছিল অলোকরঞ্জনের প্রয়াস, অন্য দিকে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছিল আমাদের কবিতা।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'তে যখন সংযোজন করছেন বিভাব-কবিতা, তখন তিনি আরও বেশি প্রত্যয়ী, সপ্রতিভতায় আরও মসৃণ। এখানে তিনি ভেঙে ফেলেছেন ছন্দের মোড়ক, উঠে দাঁড়িয়েছেন গদ্যের ভূমির ওপর, কিন্তু এমন সে গদ্য যাকে কবিতা বলে ভ্রম হতে পারে প্রথম নজরে। —

এই মুহূর্তে যে-মানুষটি চলে যাচ্ছে আমি তাকে মন্ত্রের ভিতরে তুলে নিলাম।
তুমি এক থেকে দশ গোনো আমি তারি মধ্যে দেবো তার মাথার মুকুট,
সূর্যের সম্মান, লক্ষ কাশফুল, আপন অস্তিত্ব থেকে প্রাত্যহিকতার অন্ন...

আর নির্ভীক আস্থায় যখন তিনি স্বেচ্ছাচারে ওই কবিতাতেই তৎসম শব্দের সঙ্গে অশিষ্ট ভাষার এক মনোজ্ঞ মেলবন্ধন ঘটান, 'বুঝেছি, ভেবেছো আমি ওকে শুধু নির্বস্তুক গরিমা দিয়েই ধাপ্পা দেবো', তখন আমাদের চোখ চলে যায় ওই গ্রন্থেরই আর সব কবিতার দিকে। আমরা হাতের মুঠোয় পেয়ে যাই সমমেজাজী আরও কিছু দৃষ্টান্ত — 'নিভন্ত সূর্যকে উস্‌কে দিয়ে', 'আকাশসর্বস্ব ছাউনিটাতে হিড়হিড় করে সে আমায় আমন্ত্রণ করে', 'বহির্দ্বারে তোমার বেবি ট্যাক্সি উঠল বেজে', 'শ্রমণ বুঝতে পারলে যাচ্ছেতাই হবে', 'থার্ড ক্লাসের মৃন্ময় কামরায় দেহাতি সাতজন', ইত্যাদি।

১৯৬৯-এ 'রক্তাক্ত ঝরোখা'র বিভাব-কবিতায় আবার তিনি ছন্দকে মান্য করে নিলেন। কিন্তু এবার ছন্দ পেশ করা হল একই কবিতার কলেবরে দু-রকম বিন্যাসে। প্রথম স্তবকে,

মারাঠি প্রজাপতি আমার, ঘুরে-ঘুরে ঈশ্বরের পায়ের কাছে
অভঙ্গ শোনাও,
বাঙালি ভালোবাসা আমার, কবিওয়ালার ধরনে তুমি কিছু
হাফ-আখড়াই গাও

দ্বিতীয় স্তবকে এসে নিখুঁত ছন্দের কল্যাণেই উচ্চারণ যেন আরও ঘনতা পেল,

দেখতে-দেখতে আমি কেমন প্রিয়তমার বুকের নিচে
আলোর প্রজাপতির পাশেই স্পর্শপ্রবণ পুতুল শোয়াই,
কত সহজে আমার শরৎ চৈতালির আষাঢ়ে ভিজে
দিগ্বিদিকে ফেরার হলো। এবং ভগবানের দোহাই।

এই সঙ্গে বিষয়ভাবনায় অন্বিত হল ঈশ্বরের নানা অনুষঙ্গ : 'আমার বিষয়বস্তু, ঈশ্বর।' —

১. নোয়াখালি, শীর্ণ সেতু, আর সে-নাছোড় ভগবান

নির্বাসন

২. 'কী বোঝো তুমি, ঈশ্বরের ভাড়াটে সন্ন্যাসী?'

পুরোহিতের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর

৩. অভুক্ত দেবতার অর্ঘ্যের আপেল চিরে রক্ত
আমি সইতে পারছি না।

রক্তাক্ত ঝরোখা

৪. ভগবানের নিজের ঈগল
তারো ডানার যন্ত্র বিকল		"	"

৫. বাটিকে-আঁকা আকাশে দিনশেষে
তুমি আমার প্রিয়
রয়েছে যারা তোমার পরিবেশে
তারাও ঈশ্বরীয়		"	"

৬.		সে-পাখি
নয় বিধাতার ক্রীতদাস,
জ্ঞানের ব্যথায় একাকী

চামুণ্ডা

'রক্তাক্ত ঝরোখা'র আগের বছর ১৯৬৮-তে 'প্রতিদিন সূর্যের পার্বণ' এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। দশটি কবিতার গ্রন্থনায় এই যে একটি শীর্ণ সমাহার, তারও প্রাক্‌বচনে রইল একটি একার্দশী বিভাব, একটি নামহীন উদ্দীপন-ভাবনার বীজাংকুর, অনুষঙ্গসূত্রে যেখানে স্পর্শিত হল ভালবাসা, অপমান, ছলনা, আর 'যে-অসতী ফোটায় টগরফুল নিজের গরজে, / যে-অতিথি পিঠের পিছন থেকে ঘর ভাঙে, / যে-নারী শিশু ভাড়িয়ে ভিক্ষা চায়।' পঙ্‌ক্তিনিহিত ভাবনাগুলিই সম্প্রসারিত হতে থাকে অন্তর্গত কবিতামালায়, যা ছিল এক-একটি ছত্রের ঋজুতায়, তাই যেন প্রসারতা পেতে থাকে ক্রমিক গুচ্ছ উচ্চারণের বিভিন্ন মাত্রায়,

বিগত নারীর মুখ
অভিনেত্রীর ভঙ্গুর মুখে ভেসে ওঠে

অহরহ সুখ

মুহূর্তে ভেবেছি আমি চারদিকে দেয়াল তুলে দেব
ভালোবাসবার

নারীর নিজস্ব

ওদের মধ্যে অন্তত দুই ঘর
দেশান্তর ভালো

দম্পতি

হুবহু বিবাহিত তিনটি লোক
অবিবাহিত থাকে দিনে

ভুক্তভোগী

ওরা সবাই মশাল জ্বেলে দুপুর বেলায়
এ-ওর মুখে নানা রকম মুকুর হেলায়
এ-ওর উপর খেয়ালখুশির কুকুর লেলায়,
মেয়ে তো নয় কয়েক গুচ্ছ প্রবঞ্চনা...

আমাকে তবু তুমি অবিশ্বাসী
হতে বোলো না

১৯৭৩-এ 'ছৌ-কাবুকির মুখোশ' যখন প্রকাশ পাচ্ছে, তখন উচ্চারণে প্রবর্তিত হল অন্যতর স্বরব্যঞ্জনা। সংযোজন ঘটল অতিরিক্ত কোনও পুরাণের নয়, কবিতা তখন হয়ে উঠছে 'নিজেই নিজের পুরাণ', কিংবা 'নিজেই নিজের মুহূর্ত।' ১৯৭১-এ জার্মানিযাত্রা, তার দু-বছর পরে এই পথের সঞ্চয়। দেশান্তরের পরিক্রমা পুষ্টি জোগাচ্ছে তাঁর অভিজ্ঞতায়, 'ম্যান্ডোলিন' থেকে ঠিক্‌রে পড়ছে 'সুরসংগতির গূঢ় অতুলপ্রসাদ', সহাবস্থানে ধরা দেয় 'চন্দনকাঠে নির্মিত হাত' আর 'গথিক গির্জে', 'অহং খুশি'-র পাশে উঁকি দিয়ে যায় 'সবুজ দুর্ঘটনা', 'আরোগ্য ভোরবেলা'র পাশে দেখি 'রুগণ হবার' প্রতীক্ষা, 'একফোঁটা মেয়ে তিলাঞ্জলি' কয়েক পঙ্‌ক্তি ছাপিয়ে হয়ে ওঠে 'যীশুর দুলালী ঐ মেয়ে।' প্রাচ্য-প্রতীচ্যের 'অলীক সীমান্ত' ক্রমে চূর্ণ হয়ে যায়, মৃদু পক্ষপাতে ভেঙে যায়, 'কৃত্রিম প্রাচীর'। ঠিক এই বিপ্রতীপ অনুষঙ্গ-ভাবনাগুচ্ছ থেকেই উঠে আসছে 'ছৌ-কাবুকির মুখোশ'-এর বিভাব কবিতাটি, তার দুটি অনবদ্য স্তবক,

তুমি এসো বার্লিনের দুই দিক থেকে
অবিভক্ত শাদা-কালো খঞ্জন আমার
ছৌ-কাবুকির ছদ্মবেশে...

২

উত্তর অতলান্তিকে বৃষ্টি হলে
তোমার-এখানে কেন রৌদ্র হবে
জানি তুমি ডোরা কাটা স্বাতন্ত্র্য কায়েম রাখবে বলে
থেকে-থেকে কীরকম অচেনাসমান হয়ে যাও
এমনকি কেঁপে ওঠো তোমার ডানায় যদি হাত রাখি

নারীর চিরাচরিত প্রতিমায় বদল এল, গতিময়তার সঞ্চার ঘটল অন্যতর বিদেশী বাতাবরণে : 'তুমি নারী ট্রাক্টর চালিয়ে এলে গমখেত থেকে আঙিনায় / বীজগম নেবে বলে' কিংবা, 'নারী তুমি কৃষিসভ্যতার মাতা সভ্যতার সংকটে আবার / তোমাকে দিয়েছি ভার সবুজ বিপ্লব থেকে আরো / সার্থকতা আমাদের দেবে বলে' (ট্রাক্টর চালাও নারী, ট্যুবিঙ্গেনে)। এই সঙ্গে সম্ভবত নতুন আদলে শুরু হল অলোকরঞ্জনের সম্মুখবর্তী কবিতাকৃতির নিরীক্ষা-অধ্যায়।

ছন্দে-মিলেই গ্রথিত হলো 'গিলোটিনে আলপনা' (১৯৭৭)-র সূচক কবিতা 'জ্বর', সাত লাইনে আয়োজিত রইল এর উদ্দীপন-বিভাব। মৌল মেজাজ ব্যঙ্গাত্মক হয়ে উঠল ছোট্ট একটি সমীক্ষণে : 'সাঁওতালডি-র আলোকমালার অতীন্দ্রিয় ছল।' হয়ত বা এরই সূত্রে অন্যান্য কবিতায় অক্ষরিত হল 'চলন্ত দেয়ালি', 'অনিকেত নৌকার দীপিত রশ্মিগুলি', 'কার্বাইড-আলো', 'শহর ধুঁকছে কারা যেন আমার মধ্য দিয়ে টেনে নিচ্ছে প্রাণদ অম্লজান', 'একটু দূরে পিদিম হাতে পাতালরেল চলে', কিংবা 'তবুও জটার মধ্যে জোনাকির বিকিকিনি বাড়ে', অথবা 'এখন বাড়িতে যেতে দেরি হয় সারা রাস্তা সাপ-লুডো', — শহরযন্ত্রণার টুকরো চলচ্ছবি। আর এই নিষ্প্রদীপ নাগরিকতারই চূড়ান্ত নিরুপায় পরিস্থিতি জেগে উঠল একটি মিতবাক কবিতার দুটি স্তবকের অবকাশে,

বিদ্যুতের হঠাৎ-অভাবে
অজিতেশ (ক্রেয়ন) কেয়া (আন্তিগোনে) সংলাপ থামিয়ে দিয়ে
নগরপ্রান্তরে এক অন্ধকার মাপে
'কেন এত অন্ধকার' 'আরো কতোক্ষণ এই অন্ধকার'
একাকার দর্শকসত্তার
জিজ্ঞাসার মাঝখানে কারা যেন মঞ্চে উঠে গিয়ে

জ্বেলে দিল কয়েকটি মোম, তার সংক্ষিপ্ত আগুনে
ক্রেয়নের উত্তরীয় জ্বলে যায়, অগ্নিকাণ্ডে ঘৃতের আহুতি
আন্তিগোনে।

আন্তিগোনে মঞ্চ : কলকাতা

বাড়ন্ত বিদ্যুতের উল্লেখ থেকেই 'প্রতিবিধান' নামার্পিত একটি কবিতা রচিত হয়েছিল পরবর্তী বছরে প্রকাশিত 'লঘু সংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে' গ্রন্থটিতে, আর সেখানেও ছিল তীক্ষ্ণ শ্লেষের সংকেত : 'এ একরকম ভালো — / পৌর পিতা, অতর্কিতে / নিভিয়ে দিলে আলো।' কিন্তু বইটির কেন্দ্রিক মেজাজ এখানে ছিল না, এবং অলোকরঞ্জনীয় প্রথামত বিভাবিতও ছিল না এর উদ্বোধনী পৃষ্ঠা। সূচক কবিতাটি স্থান পাচ্ছে মধ্যপর্বে, ছন্দে, অনামী পরিচয়ে, বেজে উঠছে মন্ত্রের মত, শ্লোকের মত,

স্তোত্রে ভরেছি শিশির
শিশিরে ভরেছি স্তোত্র
এ নাকি দিবা ও নিশির
মতন খুব স্বতন্ত্র...

শিশির-দিবারাত্র-প্রভাত-নিশীথের এই নৈসর্গিক আনুষঙ্গে সত্যিই একটা স্বাতন্ত্র্য আসে ১৯৮২-র 'জবাবদিহির টিলা'-র বিভাব গদ্যায়নে। প্রকৃতি সময়ান্তরে অর্জন করে নেয় মহত্তর কিছু মাত্রা, 'মানুষের আনন্দের স্রোতে' জেগে ওঠে কবির ঘুমন্ত অভিলাষ, 'আত্মদানে আর পরিচর্যার জগতে' তিনি অন্বেষণ করে বেড়ান অস্তিত্বের অর্থ। যে প্রাকৃতিক ফুলের গায়ে শৃঙ্খলার নামে তার নাম লেখা আছে, লেখা আছে দাম, প্রাপকের পরিচয় এবং ঠিকানাও, যেখানে নথিভুক্ত হয়ে আছে প্রজাপতি তার ডানা নিয়ে, তাতে তাঁর আজ আর কণামাত্র সম্মতিও নেই। ঠিক এই নিশ্চিন্ত প্রবণতাই জাগিয়ে তুলছে এই গ্রন্থের 'বিভাব' কবিতাটিকে :

আর আমার কোনো নিসর্গ নেই, মানুষজন যখন ঘুমিয়ে পড়ে
আপাতমৃত লোকালয়ের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে অনুভব করি
অনন্ত নিসর্গের আস্বাদ যেন দেবদারুর দূতীরা ঢেলে দেয় আমার
মুখে অমৃত আঃ আমার ঘুম পায় আর দু'দিকে খাটিয়া
পেতে ঘুমিয়ে থাকে কাতারে-কাতারে নরনারী তাদের
মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবার পথটাই আজ আমার নিসর্গ

প্রকৃতি অতিক্রম করে এই মানবায়ন, নিসর্গ ছাপিয়ে নিসর্গতর লোকালয়ের মধ্যে তাঁর এই হেঁটে যাবার পথ, কবিতাকে আজ জাগিয়ে তুলতে খাটিয়া-পেতে-ঘুমিয়ে-থাকা নরনারীই তাঁর সময়োচিত উপচার।

১৯৮৩-তে 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে'। এবার তাঁর ঘরের মধ্যে 'প্রাতিভাসিক নিজস্ব পৃথিবী', এই পৃথিবীর দিকে একান্ত অভিযাত্রা। গ্রামগঞ্জের স্মরণ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসে, বুড়ো নিমগাছ মনে করিয়ে দেয় পিতামহের পদবী, অনুষঙ্গ ছাড়া এখন আর-কিছুই মনে আসে না, 'বন্ধু শুধুই হয়ে ওঠে বন্ধুজনোচিত'। 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'-র 'যে-রাখাল দূরদেশী' কবিতায় ঘনায়মান গোধূলিলগ্নে ট্রামে ওঠবার আগে কে যেন তাঁকে বলে উঠেছিল 'এবার কিন্তু আঙ্গিক বদলান'। শহরের পাঠভেদে তাঁর অতৃপ্তি ছিল, ছিল বিরূপতা আর ক্ষোভও। সেই ক্ষোভ 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে'-র বিভাব কবিতায় আত্মধিক্কারে রূপান্তরিত হলো।

সব-কিছু অবহেলে
শিল্পের দিকে সঁপেছি আমার মন।

গ্রন্থান্তরে এই পোশাক বদলের আকাঙ্খা, ফেলে-আসা দিনকে সংশোধন করে নতুন করে শুরু করার প্রবল প্রয়াস, প্রাক্তন প্রকরণের পরিমার্জনায় কবিতার শরীরে নতুন সুস্থতার সঞ্চার,

আমি এবার সেরে উঠবার আগে
একটু বেশি সময় নেবো।
যেন এবার সেরে উঠবার পরে
অসুখ না হয় আর।
...
থমকে-থেমে রুগ্ন কবিতার
সংগ্রহ তৈরী করছি, এক-এক স্তবক অনুবাদের পর
আমার ভাষায় তেজিয়ান দেখাচ্ছে।

অসুখ

এর পরে দশ বছরের প্রসারতায় আরও চারটি বইয়ের আত্মপ্রকাশ। '৮৫, '৮৮, '৯১, '৯৩-তে প্রসূত হচ্ছে যথাক্রমিক 'ঝরছে কথা আতস কাঁচে', 'ধুনুরি দিয়েছে টংকার', 'আয়না যখন নিশ্বাস নেয়' এবং 'রক্তমেঘের স্কন্দপুরাণ'। এর মধ্যে 'বিভাব'-বিহীনতায় তৃতীয় গ্রন্থটি একমাত্র ব্যতিক্রমী উদাহরণ। বাকি তিনটির শেষোক্ত দুটি-তে সংযোজিত হয়েছে দ্বিপর্যায়িক দুটি করে বিভাব-কবিতা। 'ঝরছে কথা আতস কাঁচে'-র উদ্দীপনী উচ্চারণ ছন্দ-মিলের গ্রন্থনায় দশটি চরণে পরিবেশিত। সেখানে 'বেলায়' যেমন সমীকৃত হয়েছে 'খেলায়'-এর সুবাদে, তেমনি অগতানুগতিক প্রান্তিক মিল 'শুধু' এবং 'খধূপ' অলোকরঞ্জনকে অভ্রান্তভাবে শনাক্ত করেও দেয়। আর শেষ ছত্রে সেই মিতাক্ষর কবিতায় মুদ্রিত থাকতে দেখি এক গোপন সংকল্প : 'বাচাল শব্দ পুড়িয়ে দাও'। পূর্ববর্তী আঙ্গিকসম্পর্কিত কথারই অনুরণন যেন। আবার একটা বাঁকের মুখে দাঁড়াতে দেখি কবিকে, অবাঞ্ছিত শব্দকে খসিয়ে দিয়ে আরও টান্‌টান্‌ অব্যর্থতায় এগিয়ে যান তিনি এক-একটা উচ্চারণের দিকে, একটু যেন অনায়াস হতে চান ভাষামুদ্রা নিয়ে, 'অমোঘ দুর্জ্ঞেয়তা'কে যেন তিনি আর প্রশ্রয় দিতে চান না প্রাক্তন অভ্যাসবশে। নিজের বাচনভঙ্গি আর প্রকাশরীতির মধ্যে সহজতার সঞ্চার করতে যেন তিনি আজ আরও একটু উদগ্রীব : '...আমারও / দোষ কম নয়, এরা জানে ভেবে অসংখ্য কথা / লুকিয়ে রেখেছি টেবিলের নিচে, তাদের অনুক্ত / ছায়ায় প্রচ্ছন্ন রেখেছি — আমার বর্জিত সেই / সমস্ত কথা যদি এখন ফিরিয়ে আনতে পারতাম / এরা আমাকে বুঝতে পারত' (গ্রহণবর্জন)। পাঠকের প্রতি এই দায়বদ্ধতা তো যে-কোনও লগ্নে যে-কোনও কবিরই অভীপ্সিত। একই সঙ্গে পরবর্তী গ্রন্থের 'বলতে বলতে' কবিতাটির দিকেও আমার চোখ চলে যায় যেখানে তিনি আরও অনাড়ম্বর হওয়ার জন্য জ্ঞাপন করতে চান তাঁর ঐকান্তিক প্রত্যাশা : 'তবে কি তাঁর মতো / বলতে পারব দুরূহ সব কথা / সহজ সরল করে?'

কালান্তরে অলোকরঞ্জনের এই বোধ আমাদের এক বিরাট ঝাঁকুনি দেয়, আমরা টের পাই। একটু যেন সংশয় মুহূর্তের জন্য বিচলিত করে ফেলে তাঁর যাত্রাপথ : 'চলতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি, একটু পরেই / চলতে থাকি, দ্বিধা ও গতি মিশে এখন / আরেকরকম ছন্দ জাগে' (গোধূলিময় একটি যুগল)। ১৯৮৮-তে 'ধুনুরি দিয়েছে টংকার', বিভাব কবিতা দিয়েই শুরু এর প্রাথমিক ভাবনাক্রম। ৪৪টি কবিতার অবসানে সেখানে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাপরম্পরা, এবং তার সূচনাতেও সংযোজিত হচ্ছে আরেকটি বিভাব-গ্রন্থনা। দুটি কবিতারই ভাবনাপটে গার্হস্থ্য মেজাজ তৈরি করছে অন্যতর চরিত্র। প্রথমটির অন্তর্বয়নে ভিড় করছে 'বাড়িঘরের মজ্জাগত ইট্‌সুরকি', 'ছন্নছাড়া ধুনুরি', 'গৃহকর্তা' 'ঘরবাড়ি দরদালান', 'পেঁজা তুলোর পুঞ্জরাশি', আর এক ঝলকে উচ্চারিত হচ্ছে, 'দেহই নাকি গেহতত্ত্ব?' দ্বিতীয় বিভাব এই 'গেহতত্ত্ব' থেকেই বুঝি খুঁজে নিচ্ছে অন্য এক ঈশ্বরীয় অনুষঙ্গ :

এখন বাড়ির ছায়া বাড়ির উপরে ভেসে থাকে।

একবার ভুল করে যদি ছাদে যাও দেখতে পাবে যতো
দেবতারা শরণার্থী

'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা' এই রবীন্দ্র-উচ্চারণে একসময়ে উৎকর্ণ হয়েছিলাম আমরা, দেবতাকে মানবিক উষ্ণতায় এভাবেই অন্তরঙ্গ করে তুলতে চেয়েছিল একদিন মানুষ; আর আজ অলোকরঞ্জনীয় দর্শনে বাড়ির বৈকল্পিক জাহাজের পাটাতনে 'দেবতাত্মা এবং মানুষ জায়গা বদল করছে, একই জার্সি'। তৃষিত দেবতাই যেন আজ মানুষের আশ্রয়প্রার্থী,

মানুষের বাড়ি

আগেকার মতো আজ ততো কিছু পাকাপোক্ত নয়।
মানুষ, এখন তুমি সর্বব্যাপী ধ্বংসের প্রেক্ষিতে
তবু ধরে নিতে পারো প্লাবনে তোমার বাড়িটার
জলছাদ আরো-এক গাঁথনি পায়, তবে সেখানেই
জলসত্র খুলে দাও, দেবতারা মেটাক পিপাসা।

আপাতত তাঁর শেষ বই 'রক্তমেঘের স্কন্দপুরাণ', প্রকাশিত ১৯৯৩-এর সূচনাপর্বে। আগেই উল্লেখ করেছি এখানেও 'বিভাব' কবিতা একটি নয়, দুটি, এবং উভয়েই ছন্দে গ্রথিত, মিলাশ্রিত। প্রথম কবিতায় একটি ঘুমন্ত আকাঙ্খাকে অনুবাদ করে শোনাতে দেখছি তাঁকে : 'পিলসুজটাকে বাঁশী করে যদি বাজানো যেত'। দ্বিতীয় স্তবকে আরও একটি বাসনার সাঙ্গীতিক মূর্ছনা, 'আমি তবু চাই ভোরের রাগিনী' বলতে-বলতে / 'রন্ধ্রে-রন্ধ্রে এসো গুর্জরী টোড়ি'। আর শেষতম ছত্রে এক উদাসী নিরাসক্তি : 'বলে বাঁশিটাকে ভাসিয়ে দিলাম স্রোতে...'। দ্বিতীয় 'বিভাব' কবিতায় ১৪ লাইনের অবকাশে উঁকি দিয়ে যায় পূর্বতন অলোকরঞ্জনের শিল্পিত বিভা, তাঁর আপন প্রকরণশৈলী, অপ্রচল শব্দের প্রয়োগ-প্রবণতা আর অনুপ্রাসের অনুপম অনুরণন। এই কবিতাটির জন্য, পাঠক হিসেবে মনে করি, আপাতত স্থগিত থাক আমাদের সমস্ত ব্যাখ্যা, স্তব্ধ থাক যাবতীয় সমীক্ষণ, বরং বিনিময়ে উদাহৃত হোক এর সামগ্রিক নির্মাণ, আমরা সনিষ্ঠ পাঠে শুধুমাত্র ছুঁতে চেষ্টা করি এর অন্তঃশীল উদ্দীপন-ভাবনাকে,

হলুদ সুনীল হেলিওট্রোপ ছাই ধুতুরা সবুজ সামন্তক
পেরিয়ে এলাম বর্ণের সপ্তক
অ্যালার্ম-ঘড়ির মধ্যে ছিল গচ্ছিত এক সময় সায়ন্তনে
অন্ধ চোখে চুম্বিত চন্দনে
কে দিল এই অনুশাসন : তুলসীপাতা মৃতের দুই নয়নে
রাখতে হবে — সে কোন্‌ ক্ষপণক?
অধিবাসের আগে হঠাৎ কান্না নিয়ে বিজন সেতু দেখে
জয়িতা ঐ ফিরছে, সঙ্গে কে
জানি না আমি এটুকু শুধু বলতে পারি খণ্ডপ্রলয় থেকে
মশাল জ্বেলে আমার আমন্ত্রণে
অংশ নিল এখুনি ওরা, দুধকুয়াশায় দেখুক এইবার

থমকে-থাকা কুমুদকহ্লার
আরো দেখুক চলার পথে রেখদেউল মেঘের রক্ত লেগে
ভেসে উঠল প্রসন্ন উদ্বেগে

নামহীন এই 'বিভাব'-গুচ্ছ অলোকরঞ্জনের প্রায় প্রতিটি গ্রন্থের সূচনায় প্রথাকবিতা। এগুলির সঙ্গত সূত্রপাতেই শুরু হয়েছে তাঁর উচ্চারণের আচমন, গ্রন্থে নিহিত বিষয়ভাবনাকে আলিঙ্গন করে গড়ে উঠেছে এই নান্দীপাঠ, শুভবোধে পৌঁছে দেবার তাগিদ থেকে বেজে উঠেছে এই মঙ্গলাচারণ। এদের উদ্বোধনী ভূমিকা প্রস্বরিত হয়ে গেছে সমগ্র গ্রন্থের অন্তর্ভাবনায়। তাঁর পাঠক তাই মৌল কবিতায় অনুপ্রবেশের আগে অভ্যস্ত মেজাজে তাকিয়ে দেখেন এই বিভাব কবিতা-গুলিকে, দেখেন উদ্গ্রীব উন্মুখতায়, যেখানে বাকি সমস্ত নামাঙ্কিত কবিতার সঙ্গে এই অনামী উচ্চারণগুলি গ্রথিত হওয়ার পর অলোকরঞ্জন তাঁর কবিকৃতি নিয়ে অন্যতর প্রেক্ষিতে চরিত্রবান হয়ে উঠছেন আমাদের কাছে।

অন্তরীপ, অক্টোবর ১৯৯৩ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।
বানান ও রূপ যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রাখা হল।

কীভাবে বিভাববারতা

অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

আশির দশকের শেষদিকে, জয় গোস্বামীর *ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?* প্রকাশিত হয়ে হাতে এলে তার গোড়ায় ছাপা 'হৃদি ভেসে গেল অলকানন্দা জলে'-র কোনও শীর্ষনাম ছিল না। সূচিপত্রে সে-কবিতাকে 'প্রবেশক' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। নব্বই-এ কবিতা লিখতে আসা অনেকেরই, কবিতাপাঠের জার্নিটা ছিল পশ্চাদ্‌মুখী। জয় থেকে পিছিয়ে যখন অলোকরঞ্জনে, তখন আবিষ্কার করা গেল, সেই বস্তুটি সেখানে 'বিভাব কবিতা' অভিধাপ্রাপ্ত। 'প্রবেশক'-ই হোক, অথবা 'বিভাব কবিতা'-ই হোক, ব্যাপারটা যে দিব্যি, তা সেসময় পদ্য লিখতে আসা অনেকেরই মনে হয়েছিল। সত্তরের বেশিরভাগ কবিদের কাব্য সংকলনগুলিতে সে বস্তু তেমন একটা ছিল না। নিবিড় জয়-পাঠ থেকে যখন *আলেয়া হ্রদ* ইত্যাদির প্রবেশক বেশ ঘোর তৈরি করে ফেলেছে, সে সময় *নিহিত পাতালছায়া*-র প্রথম অথবা পুনর্পাঠ আবার অন্য অভিঘাত তৈরি করল। সুচিন্তিত গ্রন্থ। শঙ্খবাবুর প্রায় প্রতিটি বই যেমন হয়, তেমনই। কিন্তু, সেখানে প্রতিটি বিভাগের জন্য আলাদা-আলাদা বিভাব কবিতার বিষয়টাও মনে ধরেছিল অনেকেরই। কেমন একটা সিদ্ধান্তে চলে আসা গিয়েছিল যে, কবিতার বই দু-প্রকার — এক, ইতিপূর্বে প্রকাশিত বিবিধ ও বিচিত্র চরিত্রের কবিতাকে দু-মলাটের মধ্যে নিয়ে আসা। আর, দুই, থিমভিত্তিক, চ্যাপ্টারে-চ্যাপ্টারে বিভাজিত সুচিন্তিত-সুপরিকল্পিত গ্রন্থ। নয়ের কবিদের কবিতার বই যখন প্রকাশিত হতে শুরু করে, তখন একটা কমন ট্রেন্ডই হয়ে ওঠে প্রবেশক বা বিভাব কবিতার উপস্থাপন। গোড়ায় যে দু-প্রকার কাব্যগ্রন্থ-ভাবনার কথা বলেছিলাম, নয়ের কবিদের বেলায় তার বেমালুম বিলয় ঘটে, দ্বিতীয় প্রকারের আঙ্গিক প্রথম প্রকারটিকে আচ্ছন্ন করে। অর্থাৎ, সাম্প্রতিক অতীতে প্রকাশিত বহুবিধ কবিতার দু-মলাটবন্দি সংকলনগুলির শিরে প্রবেশক বা বিভাব-কবিতা চড়িয়ে সেগুলিকে 'সুচিন্তিত' হিসেবে দেখানোর একটা বন্দোবস্ত করার চেষ্টা চলে। কোথাও যেন একটা আপোশ হতে থাকে। জয়-প্রবেশক, অলকরঞ্জন-বিভাব আর শঙ্খ ঘোষের অধ্যায়-নির্দেশক 'স্টাইল'-এ পরিণত হয়ে এমন এক পরিসর তৈরি করে, যেখানে স্টাইলটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এমনও কাব্যগ্রন্থের অভাব নয়ের দশকে ছিল না যেখানে প্রবেশক বা বিভাবের সঙ্গে মূল টেক্সটটির কোনও যোগাযোগ নেই।

বিভাব কবিতা-কে কী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়? গদ্যগ্রন্থে যেমন ভূমিকা থাকে, বিভাব কবিতা বা প্রবেশক কি তাই-ই? না কি তার চাইতে অধিকতর কিছু? কাব্যগ্রন্থে গদ্যভূমিকা কিছু নতুন নয়। কিন্তু কাব্যগ্রন্থে পদ্যভূমিকার ভূমিকাটি ঠিক কী? প্রবেশক বা বিভাব কবিতার কাজ সম্ভবত কাব্যসৃষ্টির ধরতাই বা মেজাজ তৈরি করা। সে হিসেবে দেখলে, গদ্যগ্রন্থের ভূমিকা বা মুখবন্ধ-র চাইতে এর চরিত্র আলাদা। ব্যাপারটা খুব সহজে বোঝা যায় উৎপলকুমার বসুর কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে। উৎপলের বহুবিচিত্র কাব্যযাত্রাপথে ততোধিক বিচিত্রনামা সব বইপত্তরকে যদি কোনও কিছু গ্রথিত করে থাকে, তবে তা তাঁর বিভাব কবিতাবলি। বিভাবহীন গ্রন্থ মানেই অপরিকল্পিত, এমনটা বলতে চাইছি না, তবে, উৎপলকুমার বা শঙ্খ ঘোষের কাব্যগৃহিণীপনার প্রাথমিক স্বাদ তাঁদের প্রবেশকসমূহ, এবং অবশ্যই এইসব রচনা কাব্যগ্রন্থগুলির পরবর্তী ক্রমের ধ্রুবপদকে নির্ধারণ করে। বিভাবের কাজ পাঠককে একাধারে আবিষ্ট করা ও গ্রন্থযাত্রায় প্রবিষ্ট করানো, কিন্তু যদি তা না হয় সে-কবিতা নৈবেদ্যের নাড়ু হয়ে অধিষ্ঠান করতে থাকে কাব্যগ্রন্থের চূড়ায়, তবে তা দিয়ে বিগ্রহ পূজা চলতে পারে বটে, কৈবল্য সাধনা কদাপি নয়।

গত শতাব্দীর নব্বই-এর কবিদের কাব্যগ্রন্থে বিভাব বা প্রবেশক কবিতা নৈবেদ্যনাড়ুর স্থানাধিকার করেছিল, নাকি ছিল অনাগত-অনন্তের জন্য ধ্যানপ্রস্তুতি, সে বিচার পাঠকরা করবেন। একজন অবজার্ভার হিসেবে বর্তমান কলমচির তাতে মন্তব্য করার অধিকার নেই, কারণ সে ব্যক্তিও নব্বইয়ের কাব্যপ্রয়াসকারীদের একজন এবং তার প্রথম কাব্যগ্রন্থটি ছিল বিভাবসম্বলিত। আত্মপক্ষে গমন নিবন্ধে অনাচার। অতএব, পরস্মৈপদী চর্চার দিকে এগোনো যেতে পারে। নয়ের দশকের গোড়ায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে যে দু-একটি বইকে ঘিরে কিঞ্চিৎ আহ্লাদ সেসময়ের কবিকুল করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল পিনাকী ঠাকুর বিরচিত *একদিন অশরীরী*। এখন, পিনাকী নব্বইয়ে গণিত হবেন কিনা, তা নিয়ে বিতণ্ডায় না গিয়ে, এটুকু বলাই যায় যে, নব্বই দশকে রচিত যে কতিপয়মাত্র কাব্যগ্রন্থে কবির স্বতন্ত্র স্বর শ্রুত হয়েছিল, পিনাকীর এই গ্রন্থ যে তাদের মধ্যে অন্যতম। এ কথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে। পিনাকীর এই বইটির স্বাতন্ত্র্য ছিল আঙ্গিক এবং বিষয় — উভয়তই। *একদিন অশরীরী*-র বিভাব কবিতাটি ছিল —

...মাত্র এ অতীত লিখে
বাকি যত প্রাণ ও ধারণ
সম্ভব কি হতো, যদি,
আমার মৃত্যুর পার থেকে
ওরকম না তাকাতে —
পুজো পুজো রোদ, হাসি খুশি?

পিনাকী 'অতীত'-কে লিখেছেন বিস্তারিতভাবে। এ 'অতীত' কখনও ব্যক্তিগত কখনও বা গণস্মৃতি থেকে উঠে আসা। আত্মনকে সামূহিক স্মৃতির সঙ্গে যিনি যুক্ত করতে চলেছেন, তাঁর প্রথম বই-এর বিভাব হিসেবে এ কবিতা ছিল মোক্ষম। *একদিন অশরীরী*, *আমরা রইলাম* এবং তার পরবর্তী *অঙ্কে যত শূন্য পেলে* জুড়ে পিনাকী লিখেছেন মফস্বল-বাংলার এমন অতীতকে, যা ইতিহাস বই-এর পাতা থেকে পিছলে গিয়েছে। অনামা কথকঠাকুর থেকে বসন্তরঞ্জন, ফকির লালন আর কাঙাল হরির সঙ্গে-সঙ্গে মাটির নিচে কয়লা হয়ে থাকা পির সাহেব যাঁর লিখনে উঠে আসবেন, আর তারই পাশাপাশি যিনি লিখবেন পাড়ার গজল সম্রাটের আত্মবিলোপ অথবা 'মাধবীকঙ্কন'-এর পাতায় জমে থাকা ঘুণবেদনাকে, তাঁর বিভাব যেন ঘোষণা করেছিল তাঁর তামাম আগামী লিখনকে। ডিপ্রেসড এবং সাপ্রেসড আত্মন এবং পুরোনো হাঁড়ির কালো অন্ধকারে সরা-চাপা ইতিহাস একত্রে উঠে এসেছে তাঁর পরবর্তী কবিতায়। 'পুজো পুজো রোদ' আর 'হাসি খুশি' এক

দূর থেকে ঝিলিক দেওয়া পশ্চাদভূমি, ওখানে ফেরা যায় না। ফিরতে নেই। শুধুমাত্র তারা আছে বলেই লেখা যায় 'প্রাণ ও ধারণ'-কে, সে সম্ভব করে সমস্ত কবিতা।

একদিন অশরীরী গ্রন্থটিতে দু-টি পর্ব বিভাজন ছিল, প্রথম পর্বে পিনাকী রেখেছিলেন ছোটো কবিতা। আর দ্বিতীয়াংশে ছিল পরিসরের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কিছু লেখা। কিন্তু, এই দুই পর্বের কোনও স্বতন্ত্র নামকরণ তিনি করেননি। দ্বিতীয় অংশে প্রবেশের মুখেও ছিল আরও একটি বিভাব —

ওরা আমায় থাকতে দিল, খেতেও
কাপড় দিল গাঁয়ের তাঁতে বোনা
খেলার ফাঁকে কুঠে-মায়ের ছেলে
আমার গোটা দু'হাত ছুঁয়ে অবাক
তাকে দিলাম বাঁ হাত, ডান হাতে
কানের লতি ছিঁড়ে : 'নতুন বউ
পরো সবুজ পাথর আজ থেকে'
চোখের পাতা, ভুরুর যত পালক,
এইটুকুনি খুকুর জন্য রেখে...

এই পর্বটিতে পিনাকী রেখেছিলেন *পাড়ি*, *আদিম জলকথা*, *তুষারযুগ* ইত্যাদি কবিতা। এইসব লেখা প্রথম পর্বটির কবিতাগুলির থেকে চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ আলাদা। এ পর্বেও 'অতীত'-কেই লিখেছিলেন পিনাকী, কিন্তু সেই অতীত এক সম্পূর্ণ কল্প-অতীত। ব্যক্তিগত বর্তমান যদিও সেই অতীতকে নির্মাণ করছে, তবু তার মধ্যে, যাকে বলে মিথ-ঘটিত উপাদান ছিল ডমিন্যান্ট। এই পর্বটি অবশ্যই দাবি করে অন্য একটি বিভাব, যেখানে এই ব্যক্তিগত মিথোপাদানকে জাস্টিফাই করা যাবে। বলাই বাহুল্য, পিনাকী সেই কাজটি করেছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই। 'নতুন বউ'-কে যে 'সবুজ পাথর' পরানোর অনুরোধ, তা গড়িয়ে গিয়েছিল আগামীর দিকে। এই গ্রন্থের অন্তিম কবিতা *একদিন অশরীরী*-র অন্তিমতম পঙ্‌ক্তিগুলি ছিল —

ভোরের লোকাল-ট্রেনে পায়েসের চাল আমি, রোগা মাসিমণি
লোভের পুলিশহাত কামড়ে দেব সাদা দুধে-দাঁতে।
হ্যাঁ স্পর্ধা, বেহুলা, সেই বাদাবন তোলপাড় রায়মঙ্গল
তুচ্ছ করে ডিঙি আমি জামালকে শহরের বড় হাসপাতালে নিয়ে যাব।
সন্ধ্যায় চড়ারঙে খিদে আর অপেক্ষার নষ্ট মণিদীপা
বালিকাবেলার মতো বাবার উষ্ণতা দেখো মাংসকেনা পুরুষের হাতে।
চণ্ডালের হাড় গাও 'পথের ক্লান্তি ভুলে', আর শীত রাতে
নতুন আধুলি আমি বেজে উঠব অন্ধের থালায়...

দ্বিতীয় পর্বের বিভাব কবিতার সঙ্গে যদি পড়া যায় এই কাব্যপঙ্‌ক্তিগুলিকে, তবে বোঝা যাবে যে এক অত্যন্ত যত্নে পরিকল্পিত প্রকল্পকে নির্মাণ করেছিলেন পিনাকী। অতীত — ব্যক্তিগত ও কল্প, একান্ত আর নৈর্ব্যক্তিক, প্রাতিষ্ঠানিক আর অন্তর্ঘাতময় — যাবতীয়কে ধরতে তিলে-তিলে প্রস্ফুটিত করেছিলেন *একদিন অশরীরী*-র মতো এক আলেখ্যকে। নব্বই-এর গোড়ায় প্রকাশিত এই বই ছিল অনুজদের কাছে মডেল — ভাবনার, আঙ্গিকেরও।

এমন কিছু কবি থেকেই যান, যাঁদের স্ফুরণসময় অনির্দেশ্য। আপাতত যাঁর কথা মনে পড়ছে, তাঁর নাম সপ্তর্ষি বিশ্বাস। এখনও পর্যন্ত তাঁর একক কাব্য সংকলন মাত্র একখানি। *পাপের তটিনী ধরে* নামের সেই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ২০০৯-এ। আখ্যাপত্রে রচনাকাল উল্লিখিত হয়েছে ১৯৯৮-২০০৭। সে হিসেবে সপ্তর্ষিকে কি নব্বই-এর কবি বলে ধরব? নাকি শূন্য দশকের? গুলিয়ে যায়। সে যাই হোক, সপ্তর্ষির কাব্যগ্রন্থটি বেশ দীর্ঘ। ছ-ফর্মার এক 'পেল্লায়' কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি দু-টি পর্বে বিভাজিত — *প্রথমাশ্রম* এবং *দ্বিতীয়াশ্রম*। দু-টি পর্বেরই স্বতন্ত্র দু-টি বিভাব রয়েছে, দু-টিকেই উদ্ধৃত করি —

ক) আমাকে আঘাত কর — আঘাতে আঘাতে —
চূর্ণ যদি ক'রে ফেল তবু
তার আগে শুধু দুই মুহূর্তের তরে —
আমাকে নির্মাণ কর
যেমন ভাস্কর
মূর্তি খোদাই করে
পাথরে, পাহাড়ে —

এবং

খ) সকালে শালিক, দুপুরে কাকের মেলা
জীবনের, নাকি উঠানের প্রাঙ্গণে —
দুপুরে খোকার প্রজাপতি-ধরা খেলা
শরতের মেঘ ভেসে যায় দূর বনে...
দুঃখী ছিলাম, দুঃখী হয়েই বাঁচি
খোকা মা'র সাথে যত খেলে কানামাছি
যত হেরে যায় তত তার জেদ বাড়ে...
ছন্দে একথা লিখেছি অদরকারে...
এই খোকা যাবে একদিন বহুদূরে
প্রজাপতি আর উঠান সাক্ষী রবে
শরীরের ভিতে সময় ভাঙবে সেতু —
মধুমালতীর নীল দিন শেষ হবে...
তবুও অশেষ সকালে কাকের মেলা
আঙিনায় আর জীবনেরো প্রাঙ্গণে —
ছায়া ও আলোয় এই কানামাছি খেলা
ওড়না ওড়াবে স্মরণে, বিস্মরণে...

দ্বিতীয়াশ্রম-এর বিভাব কবিতার শিরে উদ্ধৃতি ছিল অমিয় চক্রবর্তীর *চিরদিন* থেকে —

মানুষের প্রাণে তবু অনন্ত ফাল্গুনী
তুমি যেন বল আর আমি যেন শুনি।

কী বলতে চেয়েছেন সপ্তর্ষি? এই দীর্ঘ গ্রন্থের পাঠ সত্যিই পাঠককে এমন এক নিরালা খাঁজে নিয়ে যায়, যেখানে 'আধুনিক' নামক তকমাটি খুবই পাতলা, জোলো ও পানসে। কবিতাগুলিতে সপ্তর্ষি ব্যবহার করেছেন 'তরে' বা 'রবে'-র মতো অধুনা অপ্রচল কাব্য শব্দ। এক নিবিড় মুদ্রাদোষকে তিনি স্টাকচার করতে চেয়েছেন তাঁর স্ব-ভাবের সঙ্গে। পুনরায় প্রশ্ন, এই 'স্ব-ভাব'-টিই বা কী? সে পর্বে সপ্তর্ষি এমন একজন কবিতাপ্রয়াসী, যিনি ভৌগলিক অবস্থানজনিত কারণেই হোন, অথবা মানসিক ভূগোলকে দূরবর্তী বিন্দুতে স্থিত করার কারণেই হোন, এক নির্জনতম দ্বৈপায়ন অবস্থানকে এনজয় করেন। 'এনজয়' বলছি এই কারণে যে, আত্মমগ্নতা, বিচ্ছিন্নতা (মার্কসীয় অর্থে নয়), অধ্যাত্ম ভাবনা এবং ঐহিকতা — এসবের এক জটিল মিশেল তাঁর কাব্য।

সপ্তর্ষির কাব্যযাত্রাপথটি বেশ জটিল। ১৯৯৮ থেকে যদি তাঁর কাব্যচর্চার পরিণত অবস্থার কথাই ধরি, তাহলে ২০০৭-এর মধ্যে তিনি পরিভ্রমণ করেছেন এক অতিবিচিত্র যাত্রারেখা, স্বীকার করতেই হবে। কখনও লিরিক্যাল রোম্যান্টিকতায়, কখনও বা ধ্রুপদী ভাষায় প্রত্নানুসন্ধানে, কখনও বা চিররহস্যের প্রতি ধাবমান তাঁর রচনা। কখনও-কখনও অতিসরল ছন্দবিন্যাসে, প্রায় ছড়ার স্তরে নিয়ে গিয়ে কলমকে আরও বৈচিত্র্যের মুখ দেখিয়েছেন সপ্তর্ষি এই গ্রন্থে। প্রায় এক দশকের কবিতা এই বইতে দু-মলাটের মধ্যে ধৃত। যদি এক জায়গায় এই পঙ্‌ক্তিগুলি থাকে — 'প্রেমিকের নদী থাকে, মাঠ থাকে — / থাকে কত বর্ণময় গহন বেদনা... / গৃহস্থের শুধু এক গৃহলক্ষ্মী ছাড়া / চরাচরে কেহই থাকে না...',

তো অন্যত্র রয়েছে — 'মনে হয় মায়া শুধু শেষ সত্য এই জীবনের... / অন্য সমস্ত কিছু গৃহহীন সন্তদের মতির বিভ্রম।' এ থেকেই অনুমেয় এক মহাবৈচিত্র্যের আয়াস তিনি নিতে সমর্থ হয়েছেন। সপ্তর্ষির কবিকৃতিটিকে যথাযথ 'আধুনিক' বলতে বাধতে পারে বাংলা কবিতার অভ্যস্ত পাঠকদের। কিন্তু, একথাও সত্য, গত দশবছরে বাংলা কবিতার অন্তর্বয়ানে গূঢ়তর এবং গহীনতর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। তন্নিষ্ঠ পাঠক নাগরিক প্যাথলজি অথবা ব্যক্তিগত বিষক্ষত অথবা সামাজিক দায়বদ্ধ কবিতাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন গত কয়েক বছর ধরে। এর মধ্যে একপ্রকার ফক্কুরে এবং ছ্যাবলা কাটিং লেখার চল অবশ্যই বজায় থেকেছে। তার পাঠক অবশ্যই বাংলা কবিতার মূলধারার কেউ নন। 'মূলধারা' নামক বিষয়টিই গত দেড় দশকে এক গুহ্যধারায় রূপান্তরপ্রাপ্ত। মিডিয়াধন্য চাকমাদার অন্তামিলের কসরতসমূহকে প্রকট লোভ ও অন্তর্লালসার সিম্পটম হিসাবে আজ কাব্যপাঠক চেনেন। ফলত, সপ্তর্ষির এই দূরে সরে থাকা কাব্যের আদর এই মুহূর্তে স্বাভাবিক। যাইহোক, তাঁর *প্রথমাশ্রম*-এর বিভাবে সপ্তর্ষি লিখেছিলেন ব্যক্তিগত যন্ত্রণা থেকে কলাকৈবল্যে উত্তরণের প্রার্থনা। দ্রুপদীয়ানা তাঁর গোটা কাব্যভাষা জুড়েই। 'সমকাল' নামক এক চালাকিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। ফলত 'বাতিল' লবজ বা শব্দবন্ধকে ব্যবহার করতে তাঁর কোনও সমস্যা কখনও হয়নি। *দ্বিতীয়াশ্রম*-এর বিভাবে তাই প্রত্যক্ষভাবেই 'অপ্রচল' এক আঙ্গিককে তুলে এনেছেন সপ্তর্ষি। চিরবহমান জীবন অথবা তার পরবর্তী চিররহস্য এবং তদনুষঙ্গে 'মধুমালতীর নীল দিন' ফুরনো কালাতীতকে উপস্থাপন করতে এ-প্রকার বিভাব যে অনিবার্য, তা এই কুশলী ভাবুক জানেন।

শূন্য দশকের কবিতার সঙ্গে এখনও পর্যন্ত আমাদের তেমন নিবিড় পরিচিতি ঘটেছে কি? যদি অন্তঃস্থলে নেতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়, তবে একথাও সত্য যে, গত দশকটিতে তেমন 'প্রতিনিধি-স্থানীয়' কবির সাক্ষাৎ না পাওয়াটা সে দশকের কবিদের ত্রুটিও নয়। গত দশ বছরে বাংলা কবিতার জগতে তেমন প্রতিনিধি-স্থানীয় কবিতা পত্রিকার অনুপস্থিতি এবং বাংলা কবিতার জ্যাঠামশাই-নিয়ন্ত্রিত পরিসরে শূন্য দশক সম্পর্কে নীরবতা এবং সেই সঙ্গে ওই দশকের কবিদের তরফে তার পূর্ববর্তী দশকের শেষপাদের এক-দুইজন চাকমাদার পঙ্‌ক্তি লেখকের অনুবৃত্তি একযোগে দায়ী। তবে, গত দশ বছরে যে সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত কাব্যগ্রন্থ একেবারেই প্রকাশিত হয়নি, তা-ও নয়। তবে, এই নিবন্ধের ক্ষেত্রে যে ক-টি গ্রন্থকে আলোচনার জন্য বেছে নিচ্ছি, তাদের রচয়িতারা সম্ভবত কোনও ভাবেই হাইলাইটেড হননি।

২০০৯-এর জানুয়ারিতে *কবিতীর্থ* থেকে প্রকাশিত হয়েছে অগ্নিদীপ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ *নিশ্চিত, সরল কবিতা,* ক্রাউন সাইজের দু-ফর্মার পেপারব্যাক এই গ্রন্থে আশিটি কবিতা রয়েছে। সব কবিতাই শিরোনামহীন। অর্থাৎ, এই আশিটি কবিতা একটি সিরিজভুক্ত বলেই ধরে নেওয়া যায়। এই গ্রন্থে অগ্নিদীপ অবশ্যই একটি বিভাব বা প্রবেশক রেখেছেন। কিন্তু ঠিক তার আগের পাতায় *হীকারোক্তি* শিরোনামে তিনি আরও একটি কবিতা লিখেছেন। প্রথমে সেটিকে উদ্ধার করি —

আমার বিদ্যাভ্যাস নেই। শূন্যগর্ভ প্রকোষ্ঠের দরওয়াজা সপাটে খোলার
পর বাকিটা ভুলে যাই।

দুগ্ধ সফেদ কমোড, পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রে চিরকালই রূপকায়িত হয়েছে।
এহেন বলিষ্ঠ ঘোষণার পর স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে।
উত্তরে বলি, আগেরবারের ফুটবল বিশ্বকাপ যেন কোথায় হল ভায়া...

দ্বিতীয় স্তরে উদ্ধার করি বিভাব কবিতাটিকে —
এই তো আবিষ্কার; তন্নিষ্ঠ শোকের জড়তা।
গান গাওয়া শেষ হলে, প্রতিটি শস্য-সমারোহে
একান্ত কুসুমঘ্রাণে বাড়ি ফিরে সংগীত-ই ভাবি।

নিয়ত দু-একটি তারা, তারাদের মৃত্যু জেনেও
কখনও কি বলা যায়, কারা কারা সদ্য আগত।

অগ্নিদীপের কাব্যগ্রন্থের নামকরণ থেকে মূল কবিতাবলিতে পৌঁছনো পর্যন্ত যেন এক নির্নিমেষ লুকোচুরির প্রয়াস। *হীকারোক্তি* কবিতাটিকেও যদি বিভাব-গোত্রেরই ধরি, তাহলে সেখানে আত্মনশূন্যতা, আপত অ্যামনেশিয়া এবং প্রতীকায়িত বাবুয়ানির সঙ্গে অর্থহীনতার এক গূঢ় সাজিশকে অগ্নিদীপ বলেছিলেন। গোটা কাব্যগ্রন্থ জুড়ে সেই খেলাই খেলেছেন তিনি নিরলসভাবে।

ক) সরলরেখার প্রতি বিশ্বাসে জেগে থাকে গৃহ।
অনন্ত বিস্তৃত অরণ্য জ্যোৎস্নার মোহে —
গুল্ম হারায় পথ। সূত্রেরও জাদুঘুম পায়।
সরলরেখার প্রতি বিশ্বাসে গৃহ চিনে ফিরি।

৩১ সংখ্যক কবিতা

খ) রচনা পাঠিয়ে এই পূর্ণ নগ্ন পড়ে আছি।
আগে তো শস্য শুধু; এখন শয্যাবেশবাস।
অবোধ শিকড়ও যায়; ছিঁড়ে পড়ে শিরা উপশিরা —
পিয়ন বিলাসে থাক। স্বয়ং পত্রে বয়ে যাব।

১৯ সংখ্যক কবিতা

গ) বিপরীত মেরু নিয়ে, কখনও ভাবিনি কিছু আমি।
অথচ ভাবার ছিল — একথা স্মরণে এনে দিলে;
সব মেঘ সরে যায়। শেষ ধারাপাত শৈশবে।
তারপর থেকে আর,
চিলছাদে কাক বসে নাই।

১৭ সংখ্যক কবিতা

অগ্নিদীপের কাব্যধাঁচা বোঝানো গেল কি? বিমূর্তির এমন এক শ্রমসাধ্য প্রজেক্ট তিনি নিয়েছেন, যেখানে যুক্তিসূত্র অন্তর্হিত বরং এমন কিছু বিন্যাস, পঙ্‌ক্তি-পরম্পরাকে ধরে রাখে, যা আমাদের কাব্যপাঠাভ্যাসে খুব অপরিচিত নয়। কোথাও মনে হয়, বিনয় মজুমদারকে 'ডিকোড' করে চলেছেন অগ্নিদীপ। মহতী মন্বন্তর ভিতের উপর রচনা করতে চাইছেন খুলবারান্দাসহ হর্ম্য। আভাস, আভাসমাত্রই। তারপরে কিছু বলার তাগিদ তাঁর নেই। কিন্তু সে আভাস ঠিক কীসের, বলা দুরূহ। এবার যদি বিভাব (দ্বিতীয়টি)-এর দিকে ফেরা যায়, তবে দেখা যাবে যে, 'তন্নিষ্ঠ শোক', গান শেষের পরেও তার রেশ, এবং অবশ্যই নক্ষত্রলোপ ও নবাগত নক্ষত্রের অপরিচয়, তাঁকে (সেই সঙ্গে তাঁর কবিতার পাঠককেও) এক চিররহস্যের অভিমুখ বাতলায়। অথচ 'রহস্য'-টি রহস্য মাত্রই। নবাগত নক্ষত্রের যথাবিহিত পরিচয় কখনও স্বতন্ত্রভাবে জানা যাবে না। বিভাব এখানে 'ক্লু' দেয় না, আবার 'ক্লু'-ই দেয়। কারণ, গ্রন্থের দু-টি মুখপাত-কবিতাকে একযোগে পাঠ করলে বোঝা যায় কবির অভিপ্রায়। কাব্যগ্রন্থটির অন্তিম পৃষ্ঠায় চলে গেলে দেখা যাবে —

সেহেন রোমাঞ্চেও মিশে থাকে স্পর্শের মেঘ।
পিচ্ছিলপথে হেঁটে ভিটেমাটি অক্ষত কিনা
দেখতে যাওয়ার মতো আদিম রহস্যের শেষে
প্রতিটি শরীর থেকে শরীরের মেঘ সরে যায়।

৭৮ সংখ্যক কবিতা

এ রচনা সত্যিই যেন আভাসেরও পূর্বাভাস। কী হতে পারে শরীর থেকে শরীরের মেঘ সরে গেলে? পিচ্ছিল পথ ধরে ভিটেমাটি পর্যন্ত যাত্রাপথেরই বা দ্যোতনা কোথায়? উত্তর খুঁজতে-খুঁজতে আবার ফিরে যেতে হবে *হীকারোক্তি* আর বিভাবে। আপাতযুক্তির বিলয় আর নক্ষত্র-মৃত্যু ও নক্ষত্র-আগমনের কূট সোজা আঘাত করবে আভাসপ্রাপ্তির পরিচিত অভ্যাসকে।

দ্বিতীয় যে গ্রন্থটিকে বাছছি, তার নাম *তামসধ্বৈত*। অভীক ভট্টাচার্যের এই

গ্রন্থটি ২০১১-এর জানুয়ারিতে *ভাষাবন্ধন* থেকে প্রকাশিত। ৫৬ পাতার এই গ্রন্থে দু-টি পর্ব বিভাজন রয়েছে — *গন্ধর্ব* ও *প্রেত*। এ গ্রন্থের বিভাবটিকে দেখা যাক —

বনান্তরালে এই যে আজ ডেকে নিলে হে, মৃন্ময়ী।
খেলা থেকে, শ্বেতগুল্ম, ধোঁয়া-ওঠা হ্রদের নিকটে
নাভি অব্দি জিহ্বা, সে কি, চতুর্বাহু মূর্তিমতী, অয়ি,
শ্রীরূপ দেখাবে বলে লালাময় কালপরিপটে?

এ কি মায়া, নাকি আমি অ্যাতোকালই ছিলাম মায়ায়?
ভক্ষক ভক্ষণ ভুলে যদি উপবাসী হয়ে যায়
তবে কি উচিত নয়, শ্রীচরণে নয় হে তাহাকে
সসম্মানে ঠাঁই দেওয়া দুইটি শ্রীচরণের ফাঁকে?

সুখই অযোগ্য নাকি সুখেরই অযোগ্য এ প্রতিমা?
মূর্তির পিছনে থাকা খড় তুলে আজ যে শেখালে
অন্ধকে ইঙ্গিতে আর বধিরকে সুখশব্দজালে,
পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, ক্ষুধা আর ক্ষুধার্তের সীমা...

বিসর্জন-ঘাট জুড়ে ঢাক বেজে উঠলো অন্ধ তালে।

গন্ধর্ব পর্যায়টিতে অভীক রেখেছেন যেসব কবিতা, তার চরিত্র ঐহিক মাত্রার। তাকে 'তামস' হিসেবেও দেখা যায়। আর *প্রেত* পর্বে তাঁর ভুবন ছেয়ে আছে আপাত অমঙ্গলবাহী, লুপ্ত পূজাবিধিসম্বলিত, জাদুবৈভবসম্পন্ন দেবীর হাস্য। অভীকের কবিতার ব্যাখ্যা বা অতিব্যাখ্যা কাঙ্ক্ষিত নয়। বরং এটুকু বলাই যায় যে, অভীক যেসব ঘুঁটি নিয়ে খেলতে নেমেছেন, তা বাংলা আধুনিক কবিতায় খুব একটা দৃষ্টপূর্ব নয়। এই গা-ছমছমে জগৎটিতে প্রবেশের চাবিকাঠি অবশ্যই বিভাবে ব্যক্ত। 'ক্ষুধা' আর 'ক্ষুধার্ত'-এর জগৎ যদি *গন্ধর্ব* অংশটি হয়ে থাকে, তবে 'পঞ্চাশৎবর্ণময়ী'-র উদ্দেশে সাজানো পঞ্চমুণ্ডীর সাধনাসন *প্রেত* অংশটি। অভীকের কবিতার আয়তন ক্ষুদ্র নয়। লিখনবৈভবও বিপুল। এগুলিকে অংশত উদ্ধার করাও অন্যায়। যদি কেউ উদ্যোগ নিয়ে এ গ্রন্থটি পাঠ করেন, তবে দেখতে পাবেন, প্রেম-প্রত্যাখ্যানের চেনা ছক থেকে কী উপায়ে একজন প্রবেশ করে সান্দ্র অন্ধকারের ল্যাবাইরিন্থে। অভীক গুহাকন্দর তৈরিতে অভিলাষী, যে কন্দরের অভ্যন্তরে মুখ-ঢাকা কালো পাত্রের গর্ভে জমে থাকে মসিবর্ণা অক্ষররূপ। তিনি বর্ণমালার অধিষ্ঠাত্রী, কালকে কলণকারিণী এবং করালদংষ্ট্রা। সে নিভৃতির কাছে 'লালাময় কালপরিপটে' সবার আকৃতিই ঝরে যায়।

আলোচনার অন্তিমে যে গ্রন্থটির কথা বলতে চাইছি, তার বিভাবটি এই প্রকার —

একটি নদী হাঁটতে হাঁটতে
যখন এল উৎস থেকে
দেখতে পেল সবুজ কিশোর
বনের পাশে চলছে এঁকে
বিজন কুঁড়ের দেয়াল জুড়ে
মিশর ছবি সিন্ধু ছবি

একলা ধ্যানের রহস্যতে
জলতরঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে
প্রশ্ন অনেক করল নদী
সেই ছেলেকে তার যে সবই
জবাব ভীষণ অগোছালো
কেমনতরো আত্মরতি
আত্মছবি খুঁজতে চেয়ে
নদীর মধ্যে তাকিয়ে ছিল

নদী কি আর এসব বোঝে?
প্রশ্নপত্র মাথায় রেখে
চপলা এক মৃগীর মতো
ছেলের বুকে দুঃখে সুখে
একখানি বাঁক সৃষ্টি ক'রে
দূর অরণ্যে হারিয়ে গেল

এখন শুধু সেই নদীটার
ফিরোজারঙ আঁচল আছে
সেইখানে মেঘ রৌদ্র ছায়া
সারাজীবন ছন্দে নাচে

ছেলে শুধুই পদ্য লিখে
একটি একটি ভাসিয়ে দিচ্ছে
সেই নদীটির অগাধ জলে
লক্ষ লক্ষ পদ্যগুলি
আধেকফোটা পদ্ম হয়ে
ছন্দে শব্দে চিত্রকল্পে
সেই নদীটির চরণ পদ্মে
ভাসতে ভাসতে পরীস্থানে
ভাসতে ভাসতে ভাসতে ভাসতে...

দেবাশিস সিংহ-র *পদ্যপুরাণ, মনফকিরা* থেকে ২০১০-এর দেবীপক্ষে প্রকাশিত। ৯৫ পাতার এই গ্রন্থে পর্ববিভাজন তিনটি — *পড়শিবাড়ি, অশোকের চাকা* এবং *মাটির জাতক*। সেই সব পর্বে প্রবেশের দ্বারটিতে এই বিভাবটি যেন পাঠককে ফিরে যেতে বলে। আপাত-সরল এবং আপাত-শিথিল এই কবিতাটি যেন অবাঞ্ছিত পাঠকের সামনে এক অনন্য কাকতাড়ুয়া। এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র যে, এ কবিতা আত্মজৈবনিক। 'নদী' এখানে 'প্রেমিকা', 'দেবী', 'সময়' — যা খুশি হতে পারে। আর তারই গর্ভে নিক্ষিপ্ত কবির প্রকাশকাল পর্যন্ত জমিয়ে রাখা কবিতাবলি। মজার ব্যাপার এই যে এই আপাত-শিথিল লিরিকটি অতিক্রম করে গ্রন্থে প্রবেশ করলেই দেখা যায়, সেখানে এই মেজাজটি সম্পূর্ণতই অনুপস্থিত। বরং বহু বিচিত্র জগৎ বহু বিচিত্র কেতায় সেখানে উপস্থিত। নাজারেথ থেকে প্রাচীন আর্যাবর্ত, সখীসংবাদের আড়ঘোমটা থেকে সাম্প্রতিক গণহত্যা, 'ডাকঘর' থেকে বাংলার মেলা-মোচ্ছব যেন ওত পেতে আছে পাঠককে গ্রাস করবে বলে। মনে রাখা দরকার গ্রন্থটির নামকরণ *পদ্যপুরাণ* — এক জটিল ডিসেপশন, এই ছদ্ম আড়ালটিকে শক্তিশালী করার জন্যই কি প্রয়োজন ছিল ততধিক ডিসেপটিভ একটি বিভাবের? অত্যন্ত দক্ষ প্রকরণে, গদ্যে এবং পদ্যে, এ গ্রন্থ সৃজিত। উট ও ক্যাকটাসের সম্পর্কের মতো অবিচ্ছেদ্য এক খাদক ও খাদ্যের সম্পর্কে লিখে গিয়েছেন দেবাশিস ক্রমান্বয়ে। পাঠ ও পাঠক এখানে যেন বিপরীত রতিক্রিয়ারত। পাঠই ভক্ষণ করে পাঠককে, পাঠক পাঠকে নয়। পাঠকৃতির চিরায়ত ছকটিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন দেবাশিস। আর তার প্রমাণ ওই বিভাব। যা পাঠকের উৎসাহকে হতোদ্যম করে, তারপর এক নীলিম নির্জনে ঠান্ডা মস্তিষ্কে চিবিয়ে খায় পাঠকের মগজ।

মজা হোক, ভারী মজা হোক, এমনতরো। বাংলা কবিতার উত্তরাধিকার ও পরম্পরার ছকটা যেন এই মুহূর্তে একটু বেশিরকমের ঘাঁটা। শূন্য দশকের এই তিনজনের কবিতা যেন সেই বার্তাই দেয়। পূর্ববর্তী দশকের এক অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে বর্তমান লেখকের সামনে এ যেন এক আশ্বাসবাণী। সাবভার্সানের একাধিক নতুন ব্লু-প্রিন্ট আবিষ্কৃত হতে দেখে ভরসা জাগে, সবটাকে তাহলে কালচার ইন্ডাস্ট্রি গিলে খেতে পারেনি!

কয়েকটি বিভাব কবিতা

ঌ

'সংকলন' নয়। 'নির্বাচিত'-ও নয়। তাক থেকে পেড়ে নেওয়া কিছু বই যেখানে বিভাব কবিতা আছে। স্বীকার করি, এই প্রয়াসে ফাঁকি আছে। ফাঁক তো আছেই। পাঠক বোঝেন, 'দায়বদ্ধ' পত্রিকাও কেন বাধ্য হয় ফাঁকিতে।

পরিকল্পনায় ছিল, বিভাব কবিতার ঠিকঠাক একটা সংকলন। হল না। *বোধশব্দ*-র অজস্র না-পারার আরও একটা।

তবু কিছু বিভাব লেখা সাজিয়ে দেওয়া গেল। 'সাজিয়ে' আর কই? সাজানো ছিলই বাংলা কবিতার অপার ভাঁড়ারে। শুধু কম্পোজ করে ছাপতে দেওয়া মাত্র।

ভূমিকায় কেবল উল্লেখ করি, দেবদাস আচার্য-র *মৃৎশকট*-এর কথা। আপাত গদ্য হলেও বিভাব কবিতার এই তালিকায় ঠাঁই দিলাম ১৯৭৫ সালের কাব্যগ্রন্থের বিভাব রচনাটি। কারো প্রশ্ন থাকলে জানাই — বিষয়, ভাষা বিচার করেছি। বাকিটা সম্পাদকীয় আপারহ্যান্ড!

ঌ

কথা কও, কথা কও।
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও?
কথা কও, কথা কও।
যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগরতলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে।
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাষ নীরব তাহার —
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন,
তুমি তারে কোথা লও!
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও।

কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও —
কথা কেন নাহি কও!
তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে!
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে
স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও।

কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাও নি তুমি,
সব তুমি তুলে লও —
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও।

***কথা ও কাহিনী*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

ঌ

ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে
ধুলোর আসর সাজিয়ে দিয়ে
পথের ধারে বসল জাদুকর।
এল উপেন, এল রূপেন,
দেখতে এল নৃপেন, ভূপেন,
গোঁদলপাড়ার এল মাধু কর।
দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটা,
কিসের-নেশায়-পাওয়া চোখটা,
চার দিকে তার জুটল অনেক ছেলে।
যা-তা মন্ত্র আউড়ে, শেষে
একটুখানি মুচকে হেসে
ঘাসের 'পরে চাদর দিল মেলে।
উঠিয়ে নিল কাপড়টা যেই
দেখা দিল ধুলোর মাঝেই
দুটো বেগুন, একটা চড়ুই-ছানা,
জামের আঁঠি, ছেঁড়া ঘুড়ি,
একটিমাত্র গালার চুড়ি,
ধুঁইয়ে-ওঠা ধুনুচি একখানা,
টুকরো বাসন চিনেমাটির,
মুড়ো ঝাঁটা খড়কেকাঠির,
নলছে-ভাঙা হুঁকো, পোড়া কাঠটা —
ঠিকানা নেই আগুপিছুর,
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা।

খাপছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

***

তন্বী সে যে।
জীবনের রুদ্র বহ্নি তাই কি নিঃস্তেজ
জ্বলে ক্ষুদ্র চক্ষুদীপে তার?
জগতে যা হেয়,
নিতান্ত নশ্বর দীন তুচ্ছ অবজ্ঞেয়,
তাদের সবার
নিঃসার নির্যাসে রচা সে-ভঙ্গুর কায়া।
তাই তার সংকুচিত ছায়া
রূপান্ধের দৃষ্টিপথে গর্বপুষ্ট মলিনতা ভরি,
ধরার অরূপ সিদ্ধি রাখে না আবরি।
নম্র তার আশুতোষ ক্ষুধা
কখনও করে না দাবি অনুদার অমরার সুধা;
শুধু যাচে
পার্থিব সুরার ফেনা অপব্যয়ী বিলাসের কাছে।
সে জানে আপন সীমা,
তাই তার আশ্লেষের ক্ষীণাস্থি ভঙ্গিমা,
কালের কবল হতে কেড়ে,
পারে না, সাবিত্রীসম, রক্ষিতে প্রেমের কঙ্কালেরে;
তাই তার ভীরু কণ্ঠস্বরে
পলাতক নির্ঝরিণী স্নিগ্ধ সুরে প্রতিধ্বনি করে;
নিঃসঙ্গ পান্থেরে তাই ডাকি,
সে দেয় জড়ায়ে ভুজে আশুক্লান্ত কুসুমের রাখি
স্বয়ংবরা বসন্তসন্ধ্যায়;
মুক্তধারা আনন্দের অলকনন্দায়
তাই সে চাহে না বাঁধিবারে
বৈরাগীর রুক্ষ জটে, শক্তির উদ্ধত অহংকারে।
সে যে অনামিকা
অনিত্যা মৃন্ময়ী অল্পা, তবু তার রূপমরীচিকা
নিশ্ছায় অমিত শূন্য মরুভূমিমাঝে
অন্তিম সম্বলসম দিশাহারা নয়নে বিরাজে।

তন্বী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

***

পটভূমিকা অন্ধকার   আপন স্বত্ব অধিকার
রাখুক, আমি শরীর নোয়াবো না,
একটি মাত্র রাখাল যাক,   এ মাঠ একলা পড়ে থাক
নীরবে, আমি এ মাঠ ছাড়বো না।
মরণমদমাতাল ডোম   সবি করুক উপশম
শ্মশানে, আমি জীবন ছাড়বো না।
গঙ্গাজলে উঠুক পাপ   সূর্য হোক অপ্রতাপ
সকালে, আমি কিরণ বিকাবো না।
ভগবানের গুপ্তচর   মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর
ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না,
অপ্রসর সমুদ্রকে   শামুক দেখুক প্রেমের চোখে
বিমাতা মাটি তার কাছে যাবো না।
ধরিত্রীর নীবিবন্ধে   জগৎ যদি মহানন্দে
অন্ধ, আমি প্রহরী যন্ত্রণা
মানুষ গিলে নামের খনি,   আমার পরে এই ধরণী
সঙ্গোপনে অলোকরঞ্জনা॥

***যৌবনবাউল*, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত**

***

মারাঠি প্রজাপতি আমার, ঘুরে-ঘুরে ঈশ্বরের পায়ের কাছে
অভঙ্গ শোনাও,
বাঙালি ভালবাসা আমার, কবিওয়ালার ধরনে তুমি কিছু
হাফ-আখড়াই গাও —

দেখতে-দেখতে আমি কেমন প্রিয়তমার বুকের নিচে
আলোর প্রজাপতির পাশেই স্পর্শপ্রবণ পুতুল শোয়াই,
কত সহজে আমার শরৎ চৈতালির আষাঢ়ে ভিজে
দিগ্বিদিকে ফেরার হল। এবং ভগবানের দোহাই
চিত্রিত কাঁচুলি জুড়ে বিশ্বভুবন দেখতে-দেখতে
আমি সেদিন বলেছিলাম 'আল্লা মেঘ দে' 'আল্লা মেঘ দে';
তোমার দয়ায় আজকে আমার ঘরে হাজার মেঘের মজুত,
আমি সেব মেঘের ধারায় অবিশ্বাসের সকল খোয়াই
মুছে দিয়ে তোমার কাছে দাঁড়াব খুব অপ্রস্তুত!

***রক্তাক্ত ঝরোখা*, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত**

***

একদিন সে এসে পড়েছিল এই ভুল মানুষের অরণ্যে। হাতে তাদের গা ছুঁতে গিয়ে কর্কশ বল্কল লাগে বারে-বারে।

আজ মনে হয় কেন সে গিয়েছিল। সে কি ভেবেছিল তার চিকন মোহ উদ্ভিন্ন করে দেবে অন্ধকারের শরীর? সে কি যেন মেঘলা জল কালো বনের মাথায়? প্রতিটি পাতা তার নন্দন বরণ করে নেবে সবুজ কৃতজ্ঞতায়? আঙুরের আভার মতো দৃষ্টি-ধুয়ে-দেওয়া প্রান্তবেলা?

আজ মনে হয় কেন সে ভেবেছিল। সেই অরণ্যের মধ্যে সেও এক তামসী বৃক্ষ যে নয়, এই কি তার জীবন?

জরাজটিল অরণ্যে তার ঠাঁই হলো না, ঠাঁই হলো না ভালোবাসার আকাশে। সে নেমে থাকল মধ্যপথের অজস্র শূন্যের মাঝখানে। নিঃসীম নিঃসঙ্গ শূন্যে কেঁপে উঠল হৃদয়, ভয়ে জমজম করতে থাকল তার রাত্রির মতো হৃদয়।

আর এই রাত্রি দুলছে নিঃশব্দ বাদুড়ের মতো তাকে ঘিরে। চোখে পড়ে তারই নিরন্তু কালোয় অন্ধ অরণ্যের মূঢ় গর্জন, 'তাকে ঢেকে দাও' 'তাকে ঢেকে দাও' রব করতে-করতে ছিটকে বেড়ালো এধার থেকে ওধার, খসে-পড়া নক্ষত্র বেজে রইল বুকের মাঝখানে, 'তাকে চোখ দাও' 'তাকে চোখ দাও' বলতে-বলতে সীমাহীন ভয়ে তার চোখ ঢাকল দু-হাতে।

আজ তুমি, যে-তুমি অপমান আর বর্জনের নিত্য পাওয়া নিয়ে তবুও মুঠোয় ধরেছ আমাকে, আমাকেই, আমাকে

সেই তুমি আমার অন্ধ দু-চোখ খুলে দাও, যেন সইতে পারি এই পৃথুলা পৃথিবী, এই বিপুলা পৃথিবী, বিপুলা পৃথিবী...

***নিহিত পাতালছায়া*, শঙ্খ ঘোষ**

ঌ

পাবে আমাকেও। বাদার জঙ্গলে
এক পোর্তুগিজ অশ্বতর তোমাকে দেখাবে
আমি ও হেঁতাল কাঁটা ও-পশুর মাংসে বিঁধে আছি।
লৌহকণার গান শুনে যাও। শ্বেতকণিকার ক্ষিপ্ত নৃশংতা শোনো।
বিষ — যার চোখ নেই, বৃদ্ধি আছে, খসে পড়া আছে,
নেই ত্বক, শুধু ঝুলন্ত প্রদর আছে, পুঁজ আছে,
— এঁকে নমস্কার করো।

কবিতা সংগ্রহ, উৎপলকুমার বসু

ঌ

বিশ্বব্যাপ্ত এই জয়-পরাজয় তোমাতেও অর্শে
'না' যায়ও না বলা, 'হ্যাঁ' বলতে অমোচনীয় দ্বিধা
তাই কি অনন্যোপায়, খুঁজি তবে ভূত ও ভবিষ্যে
কোথায় তোমাতে হবে এ যাত্রা ক্ষমনীয় বুঝিবা
মৃত্যুংস্তীর্ষা কোন অভিযানে কোন হিরন্ময় সত্যের আভাসে
অরিষ্টনেমিই জানে মকর ক্রান্তির পাড়ে, হিমাঙ্কের পৌষে
তোমার ও-স্বর্ণরথ বোঝাই করেছে দিনশেষের মুকুলে রাঙা বিভা
আদিত্য, গন্ধর্ব, নাগ, ঋষি ও অপ্সরা, ওরা রথী
দ্যুতিময় রথ, অশ্ব, গতি, সঙ্গে সে — কালের যক্ষ
প্রহর উজিয়ে গিয়ে সকলে কি থেমে পড়ে সমে,
সকলের প্রাপ্য যত চুকিয়েই, — যাপনের লক্ষ্য
দিন যেন পায়, যেন পাথেয়ও বাড়ে পরিণামে
রাশিচক্র ঘুরে যায়, দেহপট ঘোরে, উদয়াস্ত যামে —
আমাকে মাড়িয়ে জাগে তোমার ও-অগ্নিরথ, রক্তমেঘে ডুবে গেল দিবা

পুরাণকল্পে পুনর্বার, সিদ্ধেশ্বর সেন

ঌ

নাচবার ইচ্ছা থাকে যদি   বলি তোমায় নাচবার বিধি
পাতা আছে এই আঁধার-হৃদি,   তাতেই নাচতে হবে।
তোমার পা শক্ত কি মোর হৃদয় শক্ত,
তবেই জানা যাবে শিবে॥

রাত্রি চতুর্দশী, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

ঌ

ধরা যাক সূর্যের রশ্মি পৃথিবীর মাটি স্পর্শ না করে পাঁচহাত ওপরে এসে থেমে গেল, মাটি ছুঁতে পারল না, তখন হইহই করে সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবেই, এবং জীবনধারণের জন্যে ঘাস ও গুল্মগুলোকে বাধ্য হয়েই তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং তাদের প্রত্যেককে পাঁচহাত লম্বা হতে হবেই।

ফুল তার নিজের চেষ্টাতেই প্রয়োজনীয় খাদ্যকণা সংগ্রহ করে সুন্দর হতে চায়, নিজের আত্মপ্রকাশের স্বার্থে, মানুষও তাই, সমাজও তাই ইত্যাদি।

এই সুন্দর হওয়ার ব্যাপারটা সূক্ষ্ম চেতনাতাড়িত। প্রকৃতির সব ব্যাপারেই এই চেতনা আছে, নিশ্চয়ই আছে। এর একটা পূর্ণতার দিকে যাওয়ার প্রবণতাও আছে এবং সবকিছুরই একটা পূর্ণতা শেষপর্যন্ত ঘটে যায়ই। যখনই পূর্ণতা তখনই তার সমাপ্তি, ব্যাস্ হলো। একে কি আপনি রূপান্তর বলবেন? তা বলতে পারেন, তাই তো বলা হয়, তা যা-ই হোক, রূপান্তরিত হয়ে সেই একই ব্যাপার, আবার সেই একই প্রবণতা, কিন্তু তা তো আর অনবরতকাল চলে না, হয়তো পৃথিবী একদিন আলোর রেখা হবে, সেই রেখা হয়তো গতিরও অধিক গতি হবে। কিন্তু ততদিনে সৌরমণ্ডলীর সাম্প্রতিক সব পরিকল্পনাই শেষ হবে, তখন এই পৃথিবীর অস্তিত্ব মহাজাগতিক স্মৃতি ছাড়া আর কী, এবং সেই স্মৃতিরই বা অস্তিত্ব কোথায়? অতএব একটা পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত করাই জাগতিক অতিজাগতিক উদ্দেশ্য, এটাই ধরে নিয়ে বলা যায়, এই ভূগোলের ওপর এই পরিকল্পনার (System) যে ভৌতিক প্রতিক্রিয়া, তার ফলেই একটা শাখা লম্বা হয়, একটা ব্যাঙ গলা ফুলিয়ে প্রেম নিবেদন করে এবং মানুষ চায় স্বাধীনতা, এইভাবে যার যেখানে মুক্তি তাকে সেদিকেই যেতে হয়। আসল ঘটনা এই যে একটি পরিকল্পনার সমাপ্তি হতে হয়তো অনন্ত কোটি বছর লাগে এবং ঐ পরিকল্পনার ভিতর থেকেই হয়তো ক্রমশ সৃষ্টি হতে থাকে নতুন কোনো অভিনব পরিকল্পনা, তখন এই ভূগোল আর ভূগোল থাকে না, হয়ে যায় আলোর বিন্দু কিম্বা ইথারকণা। কিন্তু যতদিন তা না হয়, ততদিন তার থাকে পরিকল্পনার অনুকূলে সংগ্রাম — দৈনিক যুদ্ধ —

মৃৎশকট, দেবদাস আচার্য

ঌ

হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে

অতল, তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে চিনতে পারিনি বলে
হৃদি ভেসে গেল অলকানন্দা জলে

করো আনন্দ আয়োজন করে পড়ো
লিপি চিত্রিত লিপি আঁকাবাঁকা পাহাড়ের সানুতলে
যে একা ঘুরছে, তাকে খুঁজে বার করো

করেছো, অতল; করেছিলে; পড়ে হাত থেকে লিপিখানি
ভেসে যাচ্ছিল — ভেসে তো যেতই, মনে না করিয়ে দিলে;
— 'পড়ে রইল যে!' পড়েই থাকত — সে-লেখা তুলবে বলে

কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে॥

ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?, জয় গোস্বামী

ঌ

১২ মে ৮৪ রাত্রির
সমস্ত শ্মশানবন্ধুকে

ধায় রাত্রি ধায় রাত্রি আয় ধাত্রী ভাণ্ড খুলি তোর
লিখেছি সাতকাণ্ড আমি খণ্ড করে ফ্যাল আমাকে খণ্ড হাড় খণ্ড উরু
দ্বিখণ্ডিত বস্তিদেশ, অণ্ডকাটা শিখণ্ডিত মুণ্ডুঅলা দেহ
জগৎভূমে নৃত্য করে হাত পা ছুঁড়ে নৃত্য করে
অগ্নিভূঁড়ি ফাটিয়ে শেষকৃত্য করে তোর
করে না, কেউ করায় তাকে, ওঠে রে ধূম লক্ষ পাকে
যজ্ঞভূমে কাটা আঙুল লকলকিয়ে বৃক্ষ আঁচড়ায়
হা লকলক হো লকলক ভুঁয়ে গড়ায় জ্যান্ত চোখ
কী আনন্দে স্কন্ধ ছিঁড়ে শরীরহারা কামানো এক মাথা
যায় রে যায় শূন্যপথে কাটা গলায় অগ্নি পড়ে
শেষ কামড়ে কামড়ে ধরে বক্ষহারা ভাণ্ড তোর লৌহলালা খায়

ধায় রাত্রি ধায় রাত্রি মাতৃধারা যায় রে গঙ্গায়...

উন্মাদের পাঠক্রম, জয় গোস্বামী

৯০

তস্কর? গৃহস্থের আঙিনায় চাঁদ দেখে ঘুমিয়ে পড়েছো?
দলে এসো।
ওভারহেডের তার ছাই করে দিয়েছিলো চালচোর মায়ের শরীর?
আয় খোকা।
অবিরাম সাইকেল? দড়ির ওপরে হাঁটো?
পা ওপরে নিচে মাথা? দুনিয়া মাতাও।
তাঁত ছুটে খিটকল মাকু বিঁধেছিলো পেটে?
বাবাকে এখনও মনে পড়ে?
আয় ভাই আয়।

আর তুমি, ফুটপাথে আমাদের হুল্লোট শুনে
মায়ের বুকের মধ্যে জড়োসড়ো, অবাক দুচোখ —
এখন এসো না

শুধু অপেক্ষায় থাকো।

এভাবে কাঁদে না, মৃদুল দাশগুপ্ত

৯০

অতিকাল যাও... আমার অপর এই গঙ্গাধ্ধারে
বটবৃক্ষমূলে দ্যাখে গামছা পেতেছে... বাঁকুড়ার
গোলাপী গামছা... আহা কী শীতল... অতিকাল
যাও... ওকে একটু শুতে দাও বিরক্ত কোরোনা...
ক্ষমতা বাচনে ঘেরা সমসত্ত্বা থেকে দূরে
ঐ গামছাটি পাতা... যাবতীয় মাধ্যমের
উদ্বেজনা থেকে দূরে ঐ গামছাটি পাতা...
বাগবাজারে গঙ্গাধ্ধারে পক্ষীবিষ্ঠাময় কোনও
বটমূলে বাঁধানো চাতালে... থামো অতিকাল...
দূর থেকে গামছাটিকে প্রণাম জানাও

উত্তর কোলকাতার কবিতা, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

৯০

টাটকা কাছিম, দেখো এ নির্জন ধূধু বালিয়াড়ি
যেন কেউ নেই, কেউ ছিল না, অথচ
এখানে প্রতিটি বালি ক্ষতময় — তারা চক্ষুষ্মান্

তুমি গর্ত খোঁড়ো — তারা দেখে
গর্তে ঢুকে যাও — তারা দেখে
ডিমের বুননও দেখে তারা

হে কাছিম, ফিরে এসো ঢেউয়ের গুহায়
আত্মগোপনের শর্তে, জলের অতলে
ফিরে এসো অতিকায় শ্যাওলার জগতে

আবার নতুন কোনো প্লাবনের দেখা পাও যদি
আবার নতুন কোনো বালিয়াড়ি — চর
ডিম্বময়ী হয়ে থাকো তত দিন, টাটকা কাছিম!

বানরাজপুর, একরাম আলি

৯০

রাত গভীর হলে ওরা নিখুঁত সৌন্দর্যের গল্প করতে করতে যে যায় দরজায় কড়া নেড়েছিল। আমি একা ফাঁকা রাস্তায় দু-পকেটে হাত রেখে ঘাড় নিচু করে তোমার কাছে ফিরে এলাম। আজ সবার কাছে হেনস্তা হয়ে তোমার দীর্ঘ ছায়ায় বসে রুটি আর বাঁধাকপি খাচ্ছি। তুমি ঘুমচোখে চেয়ে বোঝনি আমার তলিয়ে যাওয়া। একটু পরে বিছানাই আমার সব থেকে নিজের হবে। সমস্ত পিছুটানগুলোর কথা তোমাকে কখনো বলিনি, এমনকি অবসাদ আর ক্ষয়রোগও।

দমবন্ধ গুমোট ঘরে নষ্টমোমের দিকে চেয়ে আমার জ্বর এল।

অক্ষরে কেন কৃষ্ণছায়া, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯০

মোকাবিলা

কী দাগ ওটা কী দাগ
শীত পেরিয়ে এখন গাঢ় নিদাঘ

কিসের দাগ, লালচে-কালো, কালচে-লাল?
অস্ত্রখোয়াব ফুরিয়ে গেছে অনেককাল

হারিয়ে গেছে, আকাশ থেকে পঙ্গপাল
নামার স্মৃতি আবছা হয়ে হারিয়ে গেছে

স্মৃতির পায়ে মর্চে ধরে টান দিয়েছে

স্মৃতিতে শান, স্মৃতিতে শান, স্মৃতিতে রোজ
হাতিয়ারের নতুন নাম, স্মৃতিফৌজ —

বারুদ সংকেত, অভীক মজুমদার

৯০

ক্রোধ লুকিয়ে ফেলেছি।
দূরবীণ দিয়ে দেখি বক ওড়ে
বকের সাদা ওড়ে আকাশে আকাশে
এই যে জনসমাজ, ওষুধ, ব্যান্ডেজ
জ্বলন্ত ফুলগাছ, জানালা আড়াল
এই সবই লিখেছিল সে খাতায় খাতায়
টি.ভি.তে সকলেই বলছে ব্যক্তিহত্যা পাপ
ঐ পাপের কথায় লিখেছিল সে
খাতায়, পাতায় —
কুকুরের বোবা চাহনি লিখেছিল
আর ভাত সেদ্ধর কথা

বুনো গাধার ডাক, রাণা রায়চৌধুরী

৯০

পুড়ে যেতে যেতে তবু পাখি তার স্বধর্মে অচল
ডানায় আগুন জ্বলছে, উড়তে উড়তে তবু পৃথিবীকে
শোনায় একান্ত গান, সন্তানকে বাঁচাতে বাঁচাতে
গান গায় গান গায় মন্ত্রমুগ্ধ বিশ্বকে শোনায়

শুধুমাত্র মৃত্যুপূর্বে পাখি আসে কবির সম্মুখে
পুড়ে যেতে যেতে তবু কবিতাও স্বধর্মে অচল

বুয়া ও বাবুই, প্রসূন ভৌমিক

হাজার বছর ধরে এই বিশবছর বয়স
আমার ঘামের চেয়ে সুগন্ধি তৃতীয় বিশ্বে নেই

একদিন মাতৃকলস নিগূঢ় ঘুমের মধ্যে এক অস্ট্রিচ পাখিকে পেয়েছিলো
উজ্জ্বল পায়রার দিকে তার শাসনের পথ ভাঙনের অনুক্রমে পরাগবিদ্বেষী
তাকে নস্যাৎ করে আজ ভাষাভাষী রোদ পদ্মার আকাশ পেরিয়ে
মেঘনা নতুবা গাংচিল দেশে গড়ে তোলে গেরিলার ঘাঁটি
অশথের ডালে টুনটুনি চাঁদ দোল খায় সারাদিন

সারারাত দাঁতে দাঁত চেপে তন্তুগুলো খুলে দেয় জোড়
মুক্তাঞ্চল বিস্ফোরণে মাতে, শব্দ শোনে গ্রাম ও নগর

নাবিক জন্মের ভবিষ্য, রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

যদি তোমাকেই বলি আজ... অন্ধকার,... প্রিয় অন্ধকার,
অ্যাতো অবয়ব সবই ভুল হল অদ্ভুত আলোর মায়ায়...
প্রভার সকাশে শুধু বিভেদ ব্যক্ত হল...
প্রতিরূপে উঠে এলো অলীক প্রাকার —
প্রতিহত হল প্রাণ... অন্তিমে সেইরূপ তোমার ছায়ায়
মিশে যেতে যেতে ফের,... নিজের আলোর টানে ঘুরে
যে-টুকু স্মৃতির সবই অশ্রুত... নির্জন... হৃদয়ের দূরে
নিহিত আঁধারে রেখে তোমারই সাদৃশ্যে নিচু যে কথা জানার
জেনে একা চলে যায়... নির্মোহে ফেলে যায়...
যা কিছু অঙ্গীকার... দু'খানি ডানার...

অন্ধকারের অনুবাদ, সার্থক রায়চৌধুরী

মারতে পারো, কাটতে পারো, আবার
কষ্ট দিয়ে কাড়তে পারো ঘুম
তোমার দামি গাড়ির চাকা খিলু
চেপটে দিয়ে, ভাবতে পারে — শেষ!
আমি কিন্তু ফিরে আসব আবার
হিসেব নিতে পুরনো সব দেনার
কারণ আমি পিতার নাভিকুণ্ড
আমাকে তুমি পোড়াতে পারবে না

নশো স্কোয়ার ফিটের জাদুকর, অংশুমান কর

হৃদয় অবাধ্য মেয়ে
ওকে কোনও পড়া বুঝিও না
বইখাতা ছিঁড়ে একশা, থুতু দিয়ে ঘ'ষে
মুছে ফেলছে গাঢ় বিধিলিপি।
নীল ব্যাকরণের পাতায়
লিখে রাখছে ছেলেদের নাম...
এমনকি, ছবিও!

হৃদয় অবাধ্য মেয়ে
তাকে কী শাস্তি দেবে, দিও

হৃদয় অবাধ্য মেয়ে, মন্দাক্রান্তা সেন

হয় আমি সত্যি কথা বলি
নয় সেইসব মিথ্যে, যার জন্য খাক হয়ে আছি
এছাড়া তৃতীয় নেই, অন্য কোনও ভেজাল পাবে না

হয় আমি কষ্ট বলি নয় বলি সেইসব সুখ
যার জন্য দুবার জন্মেছি
তোমাদের মতে যদি কোনওটাই কবিতা না হয়
তা হলে কী? গসিপ? খেউড়?

তা হলে গসিপই বলব। তা হলে এটার নাম জল্পনা না হয়
শুনলে কান লাল হবে, হাড় অব্দি ঠান্ডা হয়ে যাবে

গসিপেও ভেজাল পাবে না

ভার্চুয়াল নবীন কিশোর, যশোধরা রায়চৌধুরী

১.
হা হা করো হা করো ওই
আমি শুযে নিই খাড়া তলোয়ার
তাহারও ভিতরে যে চরিত্র

২.
অথবা অবুঝ হবে নালিকা
যার নিরন্তর ভাতারবিবাহ
তারও সাথে, তারও সাথে, তারও সাথে
এই চুদুমুদু করি তবে প্রিয়
তোমাদের অনাবিল জঠরে
করিতে ইচ্ছে হয় প্রবল
এই বাটাম চয়নে
আমি হই সর্বাধিক
আমি হই

কুক্কুরী ও তাহার প্রেমিক, স্বাগতা দাশগুপ্ত

ঘর বাহির। বহুব্যবহৃত। সুন্দর। অনিন্দ্যসুন্দর
যাকে বলে। রাবীন্দ্রিক কিছুটা। তাঁত

একটি তালার দিকে অপর তালার
অপর তালার দিকে একটি তালার

যাতায়াত...

উবু সব মাদারির ভিড়, দীপাংশু আচার্য




পঞ্চদশ সংখ্যা, দ্বাদশ বর্ষ
পৌষ ১৪১৮ : জানুয়ারি ২০১২
বিনিময় মূল্য : ৩৩ টাকা